দিবস যদি সাঙ্গ হ'ল, না যদি গাহে পাখী
ক্লান্ত বায়ু না যদি আর চলে,—
এবার তবে গভীর করে' ফেল গো মোরে ঢাকি'
অতি নিবিড় ঘন তিমির তলে।

রবীন্দ্রনাথ

৺ জ্ঞানেন্দ্র নাথ দত্ত এম, এ, বি, টি,

জ্ঞানু,

এই পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি তুমি দেখিয়াছিলে এবং খুশি হইয়া তুমিই ইহার প্রকাশক হইবে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলে। আজ তুমি নাই। তুমি ছিলে এই পরিবারের শক্তি। তোমাকে হারাইয়া এই দুস্থ পরিবার বিপাকে পড়িয়াছে। তুমি ছিলে আমার পুত্রাধিক। তোমার দিব্য, প্রসন্ন দৃষ্টিই আমার সম্বল।

জ্যেঠা মশায়

ভূমিকা

গ্রন্থকার শ্রীযুত সারদাচরণ দত্ত মহাশয় প্রবীন লোক; তাঁহার বয়স এখন সাতাত্তর বৎসর। পঞ্চান্ন বৎসরের অধিক কাল তিনি শিক্ষা দান করিয়া আসিয়াছেন। সেই যুগে তাঁহার পক্ষে ধনোপার্জনের অনেক প্রকৃষ্ট ও প্রশস্ততর দ্বার উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু সমাজের কল্যাণই ছিল তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা মহনীয় অভীষ্ট। তাই তিনি শিক্ষকের এই পবিত্র ব্রত গ্রহণ করেন। অতিশয় শুচিতা ও নিষ্ঠার সহিত প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর তিনি এই পবিত্র ব্রত পালন করিয়াছেন।

এখনও সমাজের কল্যাণই তাঁহার আন্তরিক কামনা। সেই জন্যই এই বৃদ্ধ বয়সে অতি কষ্টে এই শেষ কয়টি কথা তিনি নিবেদন করিয়া যাইতে চাহেন। সারদা বাবু আমার চেয়ে সব বিষয়েই প্রবীন। তবে কেন যে তিনি আমাকে ভূমিকা স্বরূপে কিছু লিখিতে অনুরোধ করিলেন তাহা বুঝিলাম না। তাঁহার ছাত্র ও অনুরাগীর দল নিতান্ত অল্প নহে। আমার এই কয়টি কথায় তাঁহার পরিচয় আর কতটুকুই বা বিস্তৃততর হইতে পারে। আমারই বা এমন কি বিশেষ শক্তি আছে? তিনি আমাদের সকলেরই মাননীয় এবং তাঁহার তপস্যাগুণেই তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয়। কাজেই তাঁহার অনুরোধ আমি আজ্ঞা মনে করিয়াই আজ তাহা পালন করিতে বাধ্য হইলাম।

প্রায় চল্লিশ বছরের কথা। আমার পরম বন্ধু স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ মহাশয় আমাকে একদিন বলিলেন, একজন যথার্থ সমাজসেবক জ্ঞানতপস্বীকে দেখিবেন? আমি রাজি হইলাম। তিনি আমাকে

ত্রিপুরা চাঁদপুরের অন্তর্গত বাবুরহাট নামক গ্রামে লইয়া গেলেন। সেখানে দেখিলাম, চারিদিক আলোকিত করিয়া সারদাবাবু শিক্ষা ও জ্ঞান বিতরণ করিতেছেন। তাঁহার আপন ক্ষেত্রে গিয়া তাঁহার মহিমা বুঝিলাম।

এই বাবুরহাটই ছিল তাঁহার সাধনার পীঠস্থান। আমাদের দেশের সিদ্ধ যোগীরা কখনও আসন ছাড়েন না। তিনিও সারা জীবন পল্লীগ্রামের ঐ তপস্যার আসন হইতে কোন প্রলোভনেই বিচলিত হন নাই। এই কথা স্মরণে রাখিয়া সহৃদয় পাঠকবর্গ যদি তাঁহার বক্তব্যটুকু অবধান করেন তবেই যথার্থ মর্ম বুঝিবেন।

বাবুরহাট অতি সামান্য গ্রাম: তাহার কাছে মহকুমা চাঁদপুরও একটি সহর। কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি তো তাহার কাছে মহানগর। এই কথা স্মরণে রাখিয়া তাঁহার বক্তব্যের মধ্যে যে সব স্থানের উল্লেখ আছে, তাহার মহত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

চিরদিন গ্রামবাসী অল্পবিত্ত লোকের মধ্যেই তিনি কাজ করিয়া গিয়াছেন। কাজেই শিক্ষা ব্যপদেশে তিনি যে সব ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন তাহা সেই ক্ষেত্রেরই উপযুক্ত। বড় বড় সম্পন্ন জ্ঞান মন্দিরের শিক্ষাব্রতীদের কাছে হয়ত তাঁহার উপদিষ্ট উপায়গুলি অতিশয় দরিদ্র জনোচিত মনে হইতে পারে; কিন্তু ক্ষেত্রানুসারে বিচার করিলে তাঁহার বক্তব্যটুকুর সুসঙ্গতি বুঝা যাইবে।

আমাদের দেশে পূর্বকালে শতাব্দীর পর শতাব্দী যে শিক্ষা ব্যবস্থা চলিয়া আসিয়াছিল তাহা পূর্বকালে ছিল আশ্রমে, পরে তাহা আশ্রয় লইল মঠে, ও টোলে। সেই ব্যবস্থাটি কোনো মতেই উপেক্ষনীয় নহে। বহুযুগ ধরিয়া ভারতের সংস্কৃতিগুলিকে তাহাই বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ভারতের সাধনা ক্ষেত্রে গুরুরাই ছিলেন সব চেয়ে মুখ্য। শাস্ত্রজ্ঞান বা সাধনা প্রণালী সবই গুরুদের নীচে। গুরু শিষ্যে সেখানে যোগ কত ঘনিষ্ঠ এবং

কত মধুর তাহা বুঝাইবার মত অবসর এই খানে আমার নাই। তবু ভারতের সেই প্রণালীর ব্যবস্থার কথা যে উল্লেখ করিলাম তাহার হেতু এই, সেই সব গুরুদের আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। তাঁহাদের কথা উল্লেখ না করিলে আমার অমার্জনীয় অপরাধ হইবে।

ইংরেজী শিক্ষা যখন আসিল তখন আমরা সেই প্রাচীন ব্যবস্থাটি হারাইলাম। অথচ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যথার্থ প্রাণধারার সঙ্গেও যুক্ত হইতে পারিলাম না। Divorced from the old and not reclaimed by the new, এ যেন মাতৃগর্ভ হইতে বহিরাগত শিশু গর্ভের শ্বাস প্রণালীটি হারাইল অথচ বহির্জগতের নিশ্বাস গ্রহণ করিবার মত আপনার শ্বাসযন্ত্রের পূর্ণক্রিয়া লাভ করিল না।

প্রাচীন সংস্কৃতি হইতে আমরা এখন বিচ্যুত। নূতন সংস্কৃতির প্রাণ-বস্তুও আমাদের কাছে আসিয়া পৌছিল না। আমরা বায়ুপোত হইতে লাফ্ দিলাম কিন্তু প্যারাসুটটা (Parachute) তো এখনও খুলিল না। এর চেয়ে সাংঘাতিক অবস্থা আর কি হইতে পারে?

আমার মনের মধ্যে যখন এইরূপ তোলপাড় চলিয়াছে তখন বন্ধু কালীমোহন বাবুরহাটে লইয়া গিয়া আমাকে সারদাবাবুর সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। দেখিলাম তিনি আশ্রমবাসও করেন নাই, মঠেও ছিলেন না, টোলেও পড়েন নাই, তবু তিনি আমাদের সেই প্রাচীন গুরুদেরই দলে। মাছকে ডাঙ্গায় তুলিলে কি সিংহকে জলে ডুবাইলে সে নিশ্বাস হারাইয়া মরে, কিন্তু তাহাকে দেখিলাম পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য গ্রন্থাদি লইয়া বাংলার নিভৃত পল্লীগ্রামে দিব্য মানাইয়া বসিয়াছেন। দরিদ্র অশিক্ষিত গ্রাম, গরীব ছেলেপেলে, তার মধ্যেও ভারতের সেই চিরাচরিত গুরুদের একজনকে সমাসীন দেখিলাম। সেখানে তাঁহাকে

বেমানান মনে হইল না। তাঁহার চরিত্র বলেই তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিরোধকে সুসঙ্গত করিতে পারিয়াছিলেন।

এইরূপ অভিনব আসনে বসিয়াই সারদাবাবু সারা জন্ম আচার্য-জনোচিত সাধনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা তপস্যা, চাকরি নহে। তাঁহার প্রত্যেকটি ছাত্র এই কথার সাক্ষ্য দিবেন।

সেই আচার্যপ্রবর আজ পঞ্চান্ন বৎসর ধরিয়া তপস্যা করিয়া তাঁহার যে কয়টি কথা বিদায় কালে বলিতে চাহেন তাহাই আজ ব্যক্ত করিয়াছেন। কোথাও কোথাও আমার মতের ভিন্নতাও আছে, কিন্তু পঞ্চান্ন বৎসরের উপর তপস্যার পর একজন সাধক তাঁহার জীবনের অন্তিম ব্যাকুলতায় এবং 'সর্ব কল্যাণ হেতবে' যে কথা কয়টি বলিতে চান তাহা অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত শুনিতে হইবে, ধ্যান করিতে হইবে এবং গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই ভূমিকার স্থলে আমার সামান্য নিবেদন।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

শান্তিনিকেতন;
গুরু পূর্ণিমা
শ্রাবণ, ১৩৫২।

জীবন সন্ধ্যা

—:০:—

বার্ধক্যের অপ্রতিহত প্রভাব আমার দেহের সর্বত্র প্রকট হইয়াছে। বয়স আমার সত্তরের শেষ কোঠায়। বয়সের ঢেউয়ে ঢেউয়ে যেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, সেটা নদীর ভাঙ্গনের পাড়। কোন্ সময়ে অনন্তের মধ্যে ডুবিয়া যাই তাহার স্থিরতা নাই। এই জীবনে রোগযন্ত্রণাও কম পাই নাই। বাক্‌শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। ঈশ্বর কৃপায় তাহা কথঞ্চিৎ ফিরিয়া পাইয়াছি। শরীর অপটু হইলেও আমার মন যৌবনধর্মী। শক্তি হারাইয়াছি, কিন্তু ভাবনা হারাই নাই। তাই ইচ্ছা হয়, দেশের নবীনদিগকে সম্বোধন করিয়া আমার ভাবনাগুলি জীবনের শেষ বক্তব্য রূপে, বলিয়া যাই।

যত দিন কাজ করিবার ক্ষমতা ছিল, তাহার অধিকাংশ সময় শিক্ষক ছিলাম। এই শিক্ষকতার মূলে একটি ক্ষুদ্র কাহিনী আছে। যখন এণ্ট্রান্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে (Class VIII) পড়ি, তখন একজন ইংরেজি ভাষার শিক্ষক ছিলেন, যিনি ঘণ্টা বাজিবার আট প্ দশ মিনিটবে'ই পড়া বন্ধ করিতেন এবং নির্বাক

অবস্থায় বসিয়া থাকিতেন। আমরা কোন প্রশ্ন করিলে বলিতেন—"চুপ করিয়া থাক ; পঞ্চাশ টাকায় আর বেশি পড়ানো যায় না।" আমরা হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের নিকট ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করিলাম। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ লোক। উক্ত শিক্ষক মহাশয়কে তিনি এমন কিছু বলিলেন যাহার ফলে সেই শিক্ষক মহাশয় ঐ অভ্যাসটি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু আমাদের উপর ক্রোধ বশতঃ তাঁহার পড়ানোর উপকারিতাটুকু অনেকটা হ্রাস পাইল। কিছু দিন পরে ঐ শিক্ষক মহাশয় অন্যত্র বদলি হইয়া গেলেন; আমরাও বাঁচিলাম। এই ঘটনা হইতে আমাদের শ্রেণীর কয়েকটি ছাত্র এবং আমি এই প্রতিজ্ঞা করিলাম—যদি জীবনে শিক্ষকতা করি, তবে বেতনের ওজনে অধ্যাপনার এই দুর্নীতি পরিহার করিয়া চলিব। এই প্রতিজ্ঞাকারীদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট লোক এখন গভর্ণমেণ্টের জিলা স্কুলের হেড্‌মাষ্টাররূপে পেন্সন পাইতেছেন।

কর্ম জীবনে শিক্ষকতাই গ্রহণ করিলাম। সে পদে জীবনের ছাপান্ন বৎসর কাটিয়াছে।

শিক্ষকতার কালে আমার ভাগ্য বশতঃ অনেক মেধাবী এবং অন্তরঙ্গ হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রের সঙ্গ পাইয়াছি। তাঁহাদের স্মৃতি আজীবন স্মরণ থাকিবে। কেহ কেহ আমার জীবিত কালেই পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের জন্য দুঃখ আমার দীর্ঘ জীবনে অত্যন্ত বেদনার সহিত বহন করিতে হইতেছে।

আমার সহযোগী শিক্ষকবর্গের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন

করিবার এই সুযোগ পাইয়া আমি কৃতার্থ। তাঁহাদের পূর্ণ সহযোগিতা না পাইলে আমার শিক্ষকতার মূল্য কিছুই থাকিত না। স্কুলের সর্বাঙ্গীন উন্নতিই ছিল আমাদের কাম্য। সুতরাং আমরা যেন এক পরিবারভুক্ত—একই কর্মে আত্ম-নিয়োগকারী ছিলাম।

১৯২২ সনের মে মাসে যখন জানিলাম, বাবুরহাট স্কুলের শ্রীমান নলিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছে এবং বিশ টাকার বৃত্তির অধিকারী হইয়াছে তখন আমার মনে হইল, এখন আমার জীবন শেষ হইলে আমার কোন অনুতাপ নাই। আপন গ্রামের স্কুলের প্রধান শিক্ষক রূপে কাজ করিয়া ইহার বেশি মনের সুখ ও আনন্দ আর কি হইবে?

দেশবাসিগণও আমাকে যথেষ্ট সহানুভূতি এবং সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি। যখন কর্ম হইতে চিরবিদায় লই তখন ছাত্রেরা এবং তাহাদের অভি-ভাবকগণ চাঁদা তুলিয়া আমাকে এক হাজার টাকার তোড়া উপহার দেন। অনেক ভূতপূর্ব ছাত্রও ঐ ফণ্ডে অর্থ দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ঐ টাকা গবর্ণমেন্টের পেন্সন অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান। কারণ উহা দেশবাসীর দান। আমি বিনীত হৃদয়ে ঐ দান গ্রহণ করিয়াছি এবং আজিও তাঁহাদের সহৃদয়তার কথা মনে করিয়া আমার মাথা নত করিতেছি।

বাল্যকালে—সত্তর বৎসর পূর্বে দেখিয়াছি সুপারিবাগান ও

বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে ঘুমে আচ্ছন্ন এক একটি বাড়ি। লোক সংখ্যা ছিল অনেক কম। কোনও কোলাহল নাই—জীবনের তাড়াহুড়া নাই। ক্ষেতের ধান, পুকুরের মাছ ও নিজের গরুর দুধে মানুষের পেট ভাল ভাবেই ভরিত। কিন্তু ঝোপঝাড় এবং আবর্জনাকুণ্ড বাড়ির সামনেই ছিল। এখন বাসগৃহের চাকচিক্য কিছুটা বাড়িয়াছে। পূর্বে লোকে টিনের ঘর করিত। ঐটি ছিল তাহাদের উচ্চাশা। টেবিল, চেয়ার, খাট ও ছবিদ্বারা ঘর সাজান ছিল ঐ দিনের ফেশন। আজকাল লোকের রুচি পরিবর্তিত হইয়াছে। এখন লোকের ইচ্ছা ইটের পাকা বাড়ি করা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেবল মনোযোগ বাসগৃহ নির্মাণেই। কোন মনুষ্যকৃত সৌন্দর্য খুব কম বাড়ির সামনেই আছে। আলস্য এবং অবহেলায় ক্রমে বাড়ির সামনেই পানাপুকুর, ঝোপঝাড় এবং সর্বপ্রকার ময়লা সঞ্চিত হইতেছে। এদিকে আমাদের ব্যবহার পূর্ববৎ। তাহাতে এক দিকে আমাদের সৌন্দর্যবোধ ও স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে, আবার মনের ভিতরও আগাছা আর জঙ্গল জন্মিতেছে ; সে দিকে আমাদের খেয়াল নাই।

আমাদের দেশে লোকের অবস্থা কিছুতেই ভাল হইতেছে না। আয় যদিও কিছুটা বাড়িয়াছে, ব্যয় বাড়িতেছে চতুর্গুণ। সমাজের নীচ হইতে উপরে—সকলেরই চাল বাড়িতেছে। অল্পে কেহ সন্তুষ্ট নহে। খাওয়া ভাল চাই। ঘরে আসবাব না হইলে চলে না। মোটা ভাত মোটা কাপড়ে বাঁচিতে হইলে লোকে ছোট লোক মনে করিবে। বাজারে দেখা যায়—

আবশ্যক অনাবশ্যক জিনিসে দোকান বোঝাই। দেখিলে সংসারীর পক্ষে মাথা ঠিক রাখা দুষ্কর। সন্ন্যাসী হইয়া জীবন কাটান কতকটা সম্ভব। সংসারী হইয়া ভদ্রভাবে জীবন কাটান অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। প্রতিবেশী আমার সম্বন্ধে কী মত পোষণ করে—আমি ভাল খাই এবং পরি কি না—এই চিন্তায় লোক অস্থির।

শিল্পের উন্নতি ছাড়া আমাদের আর্থিক দুরবস্থার অবসান করা সম্ভব নহে। কোনও কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে সামরিক শক্তি লাভ এবং জীবন যাত্রার মান উন্নত করা অসম্ভব। নানাবিধ যন্ত্র-শিল্পের প্রতিষ্ঠা দ্বারাই ঐ দুই বিষয়ে সফলতা লাভ হইতে পারে। জাতীয় গবর্ণমেণ্ট, স্বরাজ হইলে সহস্র কোটি টাকা শিল্পের উন্নতির জন্য ব্যয় করিলে কিছুটা সম্ভব হইবে বলিয়া আমাদের দেশের আট জন শিল্পপতি পনর বৎসর ব্যাপী এক পরিকল্পনা করিয়াছেন। বৃটেনে শতকরা ৮ জন এবং আমেরিকায় শতকরা ২২ জন কৃষিকার্য করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে শতকরা ৭০ জনই কৃষক। এই সংখ্যা কমাইয়া সমস্ত দেশকে শিল্প প্রধান করিতে বিস্তর টাকা ব্যয় করিতে হইবে। কলের লাঙ্গল চালাইতে হইলে ভূমির বন্দোবস্ত আগে করিতে হয়। শিল্পকে সকল উন্নতিশীল দেশে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথম, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প,—দ্বিতীয়, রাসায়নিক শিল্প—তৃতীয়, অন্যান্য শিল্প। যৌথ বাণিজ্যনীতি দেশে অল্পই আছে। এখন আশা হয়, দেশের সর্বত্র ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা দ্বারা সে বিষয়ে খুব সহায়তা হইবে।

সমাজে নারীদের কর্মক্ষম করিতে হইবে, সেও এক সমস্যা। আমাদের সমাজ একদা স্বয়ং-পর্যাপ্ত ছিল, এখন তাহা নাই। যুক্ত-পরিবার ভাঙিয়া যাইতেছে। সমাজ পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণ করিতেছে। আমাদের সমাজ ছিল "মাতৃ-প্রধান"। আজ তাহা "স্ত্রী-প্রধান" হইতেছে—ইউরোপীয় ও আমেরিকান সমাজের মত।

বহু পরিবারে নারীরা শিক্ষা লাভ করিতেছেন। এমন কি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অনেকে উচ্চস্থান অধিকার করিতেছেন। এই রূপ শিক্ষিতা নারীরা ডাক্তার, প্রফেসর, শিক্ষক, হাসপাতালে নার্স ও নানাবিধ আপিসে কেরানী ও টাইপিষ্ট হিসাবে কাজ করিতেছেন।

এখন সব-ডিবিসনেও মেয়েদের কলেজ। পিতামাতা যেমন ছেলের পড়ার ব্যবস্থা করেন মেয়েদেরও মূর্খ রাখিতে পারেন না। উদ্দেশ্য, মেয়েদের কর্মে লিপ্ত করা এবং তাঁহাদিগকে জীবিকা অর্জনে সক্ষম করা।

স্ত্রী-পুরুষে—উভয়ে, টাকা উপার্জনের উপায় না দেখিলে লোকে বিপদে পড়িবে। সেলাইর কল, মোজার কল, বোতাম তৈরী করিবার কল সংগ্রহ করিয়া কাজ করিতে পারেন। নানাবিধ চামড়ার কাজ যেমন শ্রীনিকেতনে করে, বিড়ি তৈরি, পাট ও শন হইতে আসন; হাত পাখা, নানাবিধ পুতুল ও খেলনা; বাঁশ ও খেজুর পাতা হইতে মাদুর, ডালা; কাগজের ঠোঙ্গা, প্যাকিং বক্স; নানাবিধ ফলের আচার; সূচী শিল্প দ্বারা

কাপড়ের উপর নক্সা, রুমাল, পশমের গেঞ্জি ও মোজা ইত্যাদির যে কোন কাজে মেয়েদের লিপ্ত করিতে হইবে।

আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে শতকরা নব্বইটির জীবন পরিবারে পাকশালাতেই দিন ভর কাটাইতে হয়। কবিগুরু পাকশালার দাসত্বে নিযুক্ত নারীর বেদনা নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশ করিয়াছেন ঃ—

জানি নাই তো আমি যে কী ;
জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা
কী অর্থে যে ভরা ;
শুনি নাই তো মানুষের কী বাণী
মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি—
রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা।
বাইশ বছর, এক চাকাতেই বাঁধা। —পলাতকা—

মনীষী লেনিন বলিতেন—"যে জাতির অর্দ্ধাংশ রন্ধনশালায় দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, মুক্তি তাহার জন্য নয়।" রাশিয়ার নারীদিগকে কর্মে লিপ্ত করিয়া তিনি তাহাদের মুক্তি দিয়াছেন। মেয়েদিগকে কর্মী না করিলে, মুক্তি দূরে থাকুক, আমাদের পক্ষে বাঁচিয়া থাকাই দুষ্কর হইবে।

আমরা মনে করি, স্ত্রীশিক্ষার খুব প্রসার হইতেছে দেশে। হিসাব করিলে দেখা যায়, ১৯১৭ সনে ৬১৫ জন মেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ এবং ৫৬ জন গ্রাজুয়েট হইয়াছিলেন। ঠিক বিশ বৎসর পরে ৫০৮৩ জন মেয়ে ম্যাট্রিক ও ৮৯২ জন

বি এ, বি এস্ সি পাশ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই বুঝা যায়, আমাদের উক্ত ধারণা ভুল। ১৯৪২ সনের লোক গণনায় ঠিক হইয়াছে, ভারতীয় শিক্ষিত স্ত্রীলোকের সংখ্যা মাত্র ২•৬১ জন। হার্টগ্ কমিটি বলিয়াছেন—ভারতীয় শিক্ষাধারার উন্নতি করিতে হইলে প্রথমেই স্ত্রী শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য করা চাই। এই পর্যন্ত উহা কার্যে পরিণত হয় নাই।

আর একটি সমস্যা আছে। যথার্থ স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী কোন শিক্ষা প্রণালী আমাদের দেশে নাই। ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের একই পাঠক্রমে (Syllabus) পড়া চলিতেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতম পরীক্ষা পর্যন্ত। ইহা বঙ্গীয় সমাজের আচার ও রীতিনীতির বহির্ভূত। গার্হস্থ জীবনে শিল্প, সূচীশিল্প, সঙ্গীত, প্রাথমিক চিকিৎসার মূল্য অনেক বেশি। অধ্যাপক কার্ভের বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং দিল্লীর আরউইন কলেজে মেয়ে গ্রাজুয়েটরা ভারতীয় জীবনের উপযোগী শিক্ষা পান। মেয়েদের উপযোগী পাঠক্রম ডাঃ সার্জেণ্টের শিক্ষা সংস্কারে বিভিন্ন করা হইবে, আশা করি।

* * *

বঙ্গদেশে কত ছাত্রের অপচয় হইতেছে, ভাবিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। গৃহস্থ দেখিবে কত ধান পঙ্গপালে, পাখীতে ও ইন্দুরে নষ্ট করিল এবং কত ধান গোলায় উঠিল। ছেলেদের শতকরা কত অংশ পরীক্ষায় পাশ করিল আর কত নষ্ট হইল, কত ছাত্র নীচের শ্রেণী হইতে স্কুল পরিত্যাগ করিল—হিসাব

করিলে দুঃখ হয়। এই অপচয় কমান যায় কি না প্রত্যেক শিক্ষক ও অভিভাবক দেখিলে ভাল হয়। এক দিন এক সম্পন্ন গৃহস্থ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গত পনর বৎসরের মধ্যে আমার পরিবারের একটি ছেলেও ম্যাট্রিক পাশ করে নাই। অথচ আমি ক্রমাগত বেতন যোগাইয়াছি পাঁচ কি ছয় ছেলের। কি কারণে তাহারা ফেল হয় আপনি বলিতে পারেন কি?" আমি বলিলাম—"আপনি ত গরু পালেন। মধ্যে-মধ্যে তাহাদের পিঠে ও গলায় হাত বুলান, ঘাস পেট ভরিয়া খায় কি না দেখেন। ছেলেদের সেরূপ আদর ও খাওয়ার তদ্বির করেন কি? ছেলেরা একটু দুধ মাছ ও ডিম খায়, দেখেন কি?" তিনি বলেন—"ছেলেরা আমাকে দেখাই দেয় না, মেয়েরাই ছেলেদের দেখেন।" আমি বলিলাম, "আমি জানি আপনি রাগী মানুষ, ছেলেরা স্বাধীন ভাবে চলিতে বাধা পায়। পরিবারের দোষেই ছাত্রেরা ফেল হয়। ব্যবহার বদলাইয়া দেখিতে পারেন।"

পুত্র কন্যাকে আমরা খুব ভালবাসি যখন তাহারা শিশু থাকে। একটু বয়স হইলেই তাহাদিগকে কাছে ঘেঁসিতে দিই না। তখন অত্যন্ত হাস্যকর ভাবে আমরা গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়া চলি। ধমক ছাড়া হাসি মুখে তাহাদের সহিত কথা বলি না। ফলে, ছেলে মেয়ে অন্যত্র সঙ্গী জুটায় এবং ক্রমে শয়তানের পথে অগ্রসর হয়।

পরিবারের যিনি কর্তা তিনি সাংসারিক চিন্তায় অস্থির।

কাহারও সঙ্গে সুস্থির ভাবে, সহৃদয়তার সহিত কথা বলিবার মত তাঁহার মনের অবস্থা ও সময় নাই। বাড়ির গিন্নীরও ঐ দশা। ফলে, বাড়ির ছেলে মেয়ে অযত্নে বর্দ্ধিত হয়। অনবরত "তুই" কথা ব্যবহার ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাব ছেলে মেয়ের পক্ষে খুব খারাপ। জ্যেঠাকে, বাবাকে ও কাকাকে "তুমি" সম্বোধন করিলে ছেলে মেয়ে মনে করে—বাবা জ্যেঠা আমার অন্তরঙ্গ লোক, যাঁহাদের সঙ্গে আমি বিনা বাধায় মিশিতে পারি। ছেলে মেয়েদের প্রতি "তুমি" কথা ব্যবহার করিলে তাহারা মনে করে, আমাদের ব্যক্তিত্ব আছে, আমরা পরিবারের তুচ্ছ ব্যক্তি নই।

বাড়ি ঘর আমাদের ছেলেদের পক্ষে আকর্ষণের জিনিস নহে। বাড়ি ঘর—যেখানে স্নেহশীল পিতামাতা আছেন, ভ্রাতা ভগিনী আছেন—সে-ই ত প্রিয় ভূমি হওয়া দরকার। দোষ আমাদেরই। আমরা কি গৃহকে বাস্তবিক আকর্ষণের বস্তু করিয়া তুলিতে পারি না? পরিবারের সমস্তকে লইয়া—স্ত্রী, পুত্র, পুত্র বধু, কন্যাকে লইয়া, ছেলে মেয়ের শিক্ষায়, সংসারের ভাল মন্দের আলোচনায় কত সুখ তাহা আমরা জানি না। আমাদের পরিবারের ব্যবহার বদলাইতে হইবে।

ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সাধারণের—সমাজের হিতের অনুগত করিয়া তোলার চেষ্টা বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া হইতে পারে না। অথচ সমাজ গঠনে তাহা আবশ্যক। তার জন্য ক্ষেত্র তৈরি করিতে হয়। আমার বিবেচনায়, পরিবার ও স্কুলই সেই ক্ষেত্র।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"পরিবারের লোককে শিশুকাল হইতে মানুষ করিবার সদুপায় যদি আমরা নিজেরা না করি, তবে আমরা সর্বপ্রকারে বিনাশ প্রাপ্ত হইব—অন্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, বুদ্ধিতে মরিব এবং চরিত্রে মরিব—ইহা নিশ্চয়।"

বংশের বৃদ্ধিতে উল্লসিত হইবার কোন কারণ নাই, যদি পরিবারে কতকগুলি অকর্মণ্য বুদ্ধিহীন ছেলের জন্ম হয়। তখন পূর্ব-পুরুষের খ্যাতি প্রতিপত্তি কোনও কাজে আসিবে না। প্রতিদিন দুঃখের সহিত আমাদিগকে দেখিতে হইবে, পরিবারের শক্তি ও প্রভাব ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে এবং আমরা মরণোন্মুখ হইয়া পড়িতেছি।

* * *

যে সামাজিক পরিবেষ্টনের মধ্যে আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি, তাহারি ফলে কতকগুলি নির্দিষ্ট মনোভাব ও ধারণা আমাদের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। সেই পুরাতন ধারণা বদলাইয়া নূতন প্রকার মনোভাব লইয়া জীবনে অগ্রসর হওয়া আমরা উচিত বলিয়া মনে করি না। কেহ চোখে আঙুল দিয়া দেখাইলেও কাণা ও খোঁড়া পুত্রকন্যার মত অতিমাত্র স্নেহে পুরাতন মনোভাব ও ধারণা আমরা আঁকড়াইয়া থাকি এবং সংশোধন-কারীর প্রতি রুষ্ট হই। রক্ষণশীল সমাজে ইহা কত বড় অভি-সম্পাত তাহা আমাদিগকে ঠেকিয়া শিখিতে হইবে।

এখনকার উচ্চ শিক্ষিত অনেক যুবককে ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, স্ত্রী শিক্ষা, বিধবা বিবাহ, সর্বজনীন পূজা, নারী-হরণ এবং সাধারণের হিতাহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রশ্ন করিলে প্রায়ই সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। বরং ইঁহারা অনেক সময় বলিয়া ফেলেন—এই বিষয়ে কখনও ভাবি নাই। এই রূপ উত্তর শুনিয়া অবাক হইতে হয়। ভ্রান্ত হৌক বা অভ্রান্ত হৌক বহু বিষয়ে শিক্ষিত লোকের মতামত থাকা প্রয়োজন। বাল্যকালে কাঁচা শিক্ষা এবং বয়সের সঙ্গে মনন ক্রিয়ার সহিত ইঁহাদের যোগ নাই, এই আমার ধারণা। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে লিখিত আছেঃ—

তরবোঽপি হি জীবন্তি, জীবন্তি মৃগ পক্ষিণঃ
স জীবতি মনোযস্থ, মননেন হি জীবতি।

তরুলতাও জীবন ধারণ করে, পশুপক্ষীও জীবন ধারণ করে, কিন্তু প্রকৃত রূপে জীবিত সে-ই যে মননের দ্বারা জীবিত থাকে। মনের জীবন মনন ক্রিয়া—বিশদ রূপে উপস্থিত বিষয়ের আলোচনা এবং সেই জীবনই মনুষ্যত্ব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কেবল জ্ঞানের তৃষ্ণা জন্মাইয়া দেয় মাত্র। বি, এ, অথবা এম, এ, উপাধি প্রাপ্ত হইলেই শিক্ষার শেষ সীমায় উপস্থিত হইলাম এরূপ মনে করা মূর্খতা। এক জন লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হইলেও ইংরেজি ভাষায় অতি অল্প অধিকারই লাভ করেন। বিশুদ্ধ ইংরেজি লেখা এবং বলা তাঁহার পক্ষে সহজ হয় না। কারণ যে কয়খানি

গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি পরীক্ষায় কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছেন, তাহা বিশাল ইংরেজি সাহিত্যের বহু সহস্রাংশের একাংশ মাত্র। উহা এক গ্লাস জলের ন্যায়। উহাতে তৃষ্ণার তৃপ্তি হয় বটে, কিন্তু সন্তরণ বা অবগাহন চলে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরে যে অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার রহিয়াছে, তাহার দিকে আমাদের স্থানীয় যুবকদিগের কোন আকর্ষণ নাই।

বর্ত্তমান সময়ে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন, শিক্ষিত লোকের মধ্যে পাঠস্পৃহা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ইংরেজি ও বাংলা পুস্তকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। বিদ্যালয়ের পাঠ্য বই বিক্রীই অনেক পুস্তক ব্যবসায়ীর একমাত্র অবলম্বন ছিল। আজ তাহা নাই। স্কুলের পাঠ্য বহির অপেক্ষা বিদ্যার অনন্ত ভাণ্ডারের দিকে এই প্রসারিত দৃষ্টি আমি অন্তরের সহিত অভিনন্দিত করি। ভাল ভাল ইংরেজি পুস্তকের বিক্রী আগে বঙ্গদেশেই বেশি হইত। এখন বাংলাদেশ তাহাতে পিছাইয়া গিয়াছে। অন্য সব প্রদেশে ভাল ইংরেজি পুস্তকের আদর বেশি হইতেছে। রামানন্দবাবু ইহা দেখাইয়াছেন।

ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হইলেই ছাত্রেরা দেশ ভ্রমণে বাহির হয়। দেশ ভ্রমণ না করিলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, এই জন্য। আমাদের দেশের ছেলেরা কচিৎ তাহা করে। আমাদিগের দরিদ্রতাই উহার কারণ। দুঃখ হয়, অনেক শিক্ষিত লোক কলিকাতা কর্পোরেশনের মিউজিয়মও দেখেন নাই।

দেখিলে, বঙ্গদেশে যাহা আছে তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় পাইতেন। এবং সেই সঙ্গে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের "বক্তৃতাবলী" যদি পড়েন, তবে অন্তত বঙ্গদেশের সব সমস্যার জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। যদি এইটুকু করিতেও আমরা কুণ্ঠিত হই, তবে আর কি করিয়া চলে!

কলেজে পড়িবার সময়ে আমাদের অধ্যাপক মিঃ এন্ এন্ ঘোষ ডি, লিট মহোদয় বলিতেন—"তোমরা সংসারে কৃতী হইলে একটি বিষয়ে অবহিত হইও। নিজ পরিবারে একটি ভাল বইএর সংগ্রহ—লাইব্রেরী—যেন তোমাদের থাকে। একটি ভাল লাইব্রেরী আমি বহুমূল্য জমিদারী অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান *মনে করি।*" এই উপদেশ আমার এতই মজ্জাগত হইয়াছিল যে, যখন শিক্ষক ছিলাম, ছাত্রদের বাড়িতে লাইব্রেরী করিবার পরামর্শ দিয়াছি এবং নিজে বইএর তালিকা করিয়া দিয়াছি। সেই রূপে অনেক লাইব্রেরী এখনও বর্ত্তমান। বিশেষত, গালিম পুরের জমিদার শ্রীমান মনোরঞ্জন কর চৌধুরীর বাড়িতে তাঁহার বিশিষ্ট লাইব্রেরী আমার সেই চেষ্টার ফল।

অনেক পরিবারে ছেলে মেয়ের জন্মদিনে, নূতন বৎসরে, অথবা কোন পর্ব উপলক্ষে, তাহাদিগকে বই উপহার দিবার রীতি আছে। এই উপায়ে ঐ সব পরিবারে একটি লাইব্রেরী উপহারের বই দিয়াই গড়িয়া উঠে। এই প্রথা সব পরিবারে হয়, ইহা আমি ইচ্ছা করি। ফুল ও ফলের গাছের গোড়ায় জল না দিলে ফুল ও ফল ধরে না। বাড়ির কর্তা সে জল দান

অবাধে করিয়া যান। কিন্তু ক্ষুদ্র মানব শিশুর জন্য কিছু করা অনাবশ্যক মনে করেন। একটি ছেলের ভাল লেখাপড়ার জন্য বাহিরের বই এবং মাসিক পত্র কত প্রয়োজনীয় তাহা অভিভাবকশ্রেণী বোঝেন না।

আমি কোন দিনই মনে করি না যে, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক পড়িলেই একটি ছেলের যাহা জানা দরকার তাহা জানা সম্ভব হয়। দিন দিন জীবিকা নির্বাহ কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছে। কত দিক দিয়া, কত বিষয়ের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তাহার সীমা নাই।

কলিকাতার তিনটি দৈনিক—"আনন্দ বাজার" "যুগান্তর" ও "বসুমতী" ছেলেদের মনের খোরাক যোগাইবার জন্য তিন জন বিশিষ্ট লেখকেব অধীনে—ক্রমে "আনন্দমেলা" "ছোটদের পাততাড়ী" এবং "আমাদের পাতা" বাহির করিতেছেন। শিক্ষকগণ ঐ দিকে ছেলেদের মন আকর্ষণ করিবেন। পাঠ্য বই পড়ানই তাঁহাদের কার্য নহে। ছাত্রদিগকে চতুর ও চালাক করা চাই। সাত চড়ে যার কথা ফোটে না, এমন নিরেট, বোকা ছেলে অভিভাবকদের কোন্ কাজে লাগিবে ?

আমার বিবেচনায় হাই স্কুলের পড়া শেষ করিবার পূর্বে বাংলায় নিম্নলিখিত বই প্রত্যেক ছাত্রের পড়া উচিত :—

পদ্য—কণিকা—রবীন্দ্রনাথ
কথা ও কাহিনী ঐ
স্বদেশ ঐ

গীতাঞ্জলি রবীন্দ্রনাথ

গদ্য—বক্তৃতাবলী প্রথম খণ্ড

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

ছোট গল্প—গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ড

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড

ঐ তৃতীয় খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ

ভ্রমণ বৃত্তান্ত—রাশিয়ার চিঠি—রবীন্দ্রনাথ

পথে প্রবাসে—

অন্নদাশঙ্কর রায়

মহাপ্রস্থানের পথে—

প্রবোধ সান্যাল

উপন্যাস— গোরা— রবীন্দ্র

আনন্দমঠ— বঙ্কিম

কপাল কুণ্ডলা— ঐ

পল্লী সমাজ— শরৎচন্দ্র

মেজদিদি— ঐ

নিষ্কৃতি— ঐ

নাটক— নীলদর্পণ—দীনবন্ধু মিত্র

মেবার পতন—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

চন্দ্রগুপ্ত— ঐ

সাজাহান— ঐ

কর্মশক্তি না থাকিলে কোন কাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে না—ভবিষ্যতের যুবকেরা। ইংরেজি ভাষার জ্ঞান, দেশ বিদেশের ইতিহাস মুখস্থ বা কেমিষ্ট্রির ফরমুলা লাগে না অনেক কাজেই। বেশি লাগে, হাতের সুন্দর লেখা, টাইপ করিবার ক্ষমতা, তাড়াতাড়ি নির্ভুল লিখিবার শক্তি, শ্রমশীলতা, শৃঙ্খলা বোধ, সময়ের মিতব্যয়িতা এবং বিষয় বিভাগ করিবার ক্ষমতা।

এই যুগের ধর্মই এই—Be quick in movement, quick in understanding and smart in conversation—তাড়াতাড়ি চলা ফেরা কর, চট্‌পট্‌ বুঝ এবং আলাপে হও প্রকৃষ্ট।

পুঁথি মুখস্থ বিদ্যা আধুনিক অনেক কাজেই লাগে না। অনেক ছাত্র মুখস্থ বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারে না, কিন্তু তাহাদের হাত নিপুণ ভাবে চলে—অনেক কাজে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ না করিলেও অনেক কাজে তাহারা কৃতী হয়। আমার বিবেচনায় ষষ্ঠ শ্রেণীতে (Class VI) মুখস্থ বিদ্যায় যাহারা অকৃতকার্য হয় তাহাদের জোর করিয়া আরও চারি বৎসর হাই স্কুলে না রাখিয়া মনের গতি ও রুচি অনুসারে কারিগরি বিদ্যালয়ে দেওয়া উচিত। এইরূপ একটি বড় বিদ্যালয় চব্বিশপরগণায়, আরবালিয়ায় স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপ করিলে অনেক ক্ষেত্রে ছাত্রের জীবন ক্ষয়, আর অভিভাবকের নিরর্থক অর্থব্যয় বাঁচিয়া যায়।

বিদ্যালয়ের জীবন অন্য সব কিছু হইতে আলাদা। ওখানে হাসিতে মানা, পৃথিবীর দিকে চাহিতে মানা, সহজ হইতে মানা।

শিক্ষাকে নূতন করিয়া গড়িতে হইলে সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রাচীর ভাঙা উচিত ; যেন বিদ্যালয়গুলি সমাজের পক্ষে বোঝা না হইয়া কেন্দ্র হইতে পারে।

জল না পাইলে গাছ শুকাইয়া যায় ; রস না পাইলে মানুষ শুকাইয়া মরে। জল দাঁড়াইয়া না থাকে, তার জন্য কাটিতে হয় নালা। রস যাতে নিঃসারণের পথ পায় তার জন্য ব্যবস্থা করিতে হয়—কাব্য পাঠ, সঙ্গীত, অভিনয়, নৃত্য, ভাস্কর্য ও চিত্র। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ে ঐ সবের আদর্শ আছে। দেশের অনেক বিদ্যালয় ঐ আদর্শে অনুপ্রাণিত।

ধন্য এই বঙ্গদেশ! এখানে শিক্ষার জন্য—স্কুলের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য, গভর্ণমেণ্টের কিছু করিতে হয় না। যেখানে সেখানে জঙ্গল কাটিয়া উঠিল একটি টিনের ঘর। শিক্ষক ও ছাত্র জুটিল অনেক। লোকেরা চাঁদা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিল। শিক্ষাবিভাগ দেখিয়াও দেখেন না—এমন ভাবে নির্লিপ্ত। অনেক আবেদনের ফলে—অনেক দিন পরে, বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করিতে আসেন। ত্রুটি ধরেন বিস্তর। ঘর ক্ষুদ্র, আসবাব অপ্রচুর, খেলার মাঠ অপ্রশস্ত ; স্কুলের তহবিলে পাঁচ হাজার টাকা চাই ইত্যাদি। এই রূপ করিয়াই, তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের মধ্যে হাই স্কুল ছড়াইয়া পড়িয়াছে—বঙ্গদেশে। কত লোকের জীবন শেষ হইয়াছে এই চেষ্টায়—অনশনে, অর্দ্ধাশনে দিন গিয়াছে কত কর্মীলোকের। কত স্থানে টিনের, গোল পাতার ঘরের স্থলে দোতালা তেতলা পাকা বাড়ি হইয়াছে—গভর্ণমেণ্টের অর্থে

নহে, লোকের আত্মশক্তিতে। বঙ্গদেশে এমন লোক নাই যিনি হাই স্কুলগুলির ইতিহাস লিখিতে পারেন? আজ কাল সেকণ্ডারি শিক্ষার সংস্কার নিয়া আইন সভায় যে লাঠালাঠি হইতেছে তাঁহারা কি কেহ ভাবেন, এই শিক্ষার ইতিহাস অলিখিত থাকিলে দেশের আত্মশক্তি ও কার্যকরী শক্তির ইতিহাস ভবিষ্যৎ বংশের নিকট অকথিত রহিয়া গেল?

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিত্তগত ও সুরুচিগত করিতে না পারিলে তাহার পবিত্রতা থাকে না। বাহ্যিক সৌষ্ঠব এবং নিয়ম শৃঙ্খলা শিক্ষালয়ে এমন ভাবে থাকিবে যেন লোকে পদার্পণ করিলেই মনে না করিয়া পারিবেন না—ইহা বিদ্যাদানের পবিত্র স্থান। অনেক স্কুলে দেখা যায় সারা বাড়িটাই যেন অপরিচ্ছন্ন এবং বিষাদময়। বাহিরে আবর্জনা, ভিতরে প্রত্যেক কুঠরিতে ময়লা এবং ঝুল। আসবাব অবিন্যস্ত; স্কুলের দেয়ালে ছাত্রদের আঁকা বিচিত্র ছবি এবং সভ্যতা বিবর্জিত কদর্য লেখা। A dirty school makes dirty scholars.—পরিস্কার পরিচ্ছিন্নতাহীন স্কুলের ছাত্র মনের দিক দিয়াও হয় মলিন।

গৃহ-শিক্ষা ও স্কুল প্রদত্ত শিক্ষা একে অন্যের পরিপূরক। গৃহ-শিক্ষা না থাকিলে স্কুলের শিক্ষা তেমন ফলোপধায়ক হয় না। যেমন খাদ্যের পোষণের সঙ্গে স্বাদ ও রস থাকিলে রুচিপূর্ণ আহার হয়, তেমনি স্কুলের শিক্ষা হজম করিবার জন্য বাহিরের বই এবং দৈনিক এবং মাসিক পত্র পড়াও ছেলেদের দরকার। Dry as dust—ধূলার মত রসহীন পাঠ ছাত্রদের

পক্ষে সাংঘাতিক। শিক্ষক নিজগুণে প্রত্যেক পাঠ ন্যূনাধিক রসযুক্ত করিতে পারেন; এবং এইরূপ করিলেই ভীতি দূর হইয়া স্কুলের প্রতি ছেলেদের আকর্ষণ দৃঢ় হয়। গৃহ ও স্কুল—দুইই ছেলেদের পক্ষে আকর্ষণের বস্তু করিয়া তোলাই হইবে অভিভাবক এবং শিক্ষকের মিলিত কর্তব্য। তখন ডেনিস্ কবির ভাষায় আমরা বলিতে সক্ষম হইব—"The goal has been reached when home is school and school is home." স্কুল ও নিজ বাড়ি একই—কোন প্রভেদ নাই।

ব্যবসা বুদ্ধিতে স্কুল চালানো—ছাত্রের মঙ্গল হৌক বা না হৌক, কিন্তু তহবিল বৃদ্ধি চাই—এই দুর্বুদ্ধিতে অনেক স্কুল জাতি-ভ্রষ্ট হইয়াছে। নামে হাই স্কুল বটে, কিন্তু কাজে সুপরিচালিত নিম্ন শ্রেণীর পাঠশালা হইতেও অধম। ব্যবসায় বুদ্ধির সহিত অনেক ক্ষেত্রে পাটোয়ারী বুদ্ধির প্রাধান্য আসিয়া সব কাজ নয়-ছয় করিয়া দেয়। স্কুলের অনেক কাজ গোপন মতলব সিদ্ধির জন্য করা হয়। সুতরাং সর্বসাধারণের স্কুল হইলেও "সর্বসাধারণ" থাকে অন্ধকারে।

যদি শিক্ষকগণ বোঝেন ব্যবসায় ও পাটোয়ারী বুদ্ধিই স্কুলের প্রখর বিবেচনার বিষয় তবে "দিনগত পাপ ক্ষয়"-রীতিতে শিক্ষা কার্য চলে। নিয়ম শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ শিথিল। নিয়মিত সময়ে স্কুলে উপস্থিত হওয়া এবং পড়ানো চিরকালের কুসংস্কার বলিয়া ধরা হয়। অনেক ছাত্র ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। পড়া করিয়া স্কুলে আসা তাহাদের কাজ নহে। বৎসরের শেষে প্রমোশনের

জন্য বেশি বেগ পাইতে হয় না। স্কুল কর্তৃপক্ষের তহবিলের দিকে যখন দৃষ্টি আছে তখন ইচ্ছা করিয়া নীচের ক্লাশে না থাকিলে প্রমোশন নিশ্চয় হইবে, এই ভরসা তাহাদের আছে। ইংরেজি দূরে থাকুক, বাংলায়ও পরিষ্কার উচ্চারণে দুটি কথা ভদ্র ভাবে ইহারা বলিতে পারে না। তাহাদের পকটে পকেটে বিড়ি ও চুরুট এবং অন্যান্য অনিষ্টকর বস্তু। মুখে ইতরজনোচিত বেফাঁস কথা।

শিক্ষকদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম দলে শিল্পী--যাঁহারা শিক্ষা বিষয়কে সত্যভাবে, আর্ট স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আর দ্বিতীয় দলে Technician অর্থাৎ কারিগর। আর্টিষ্ট বা শিল্পী হিসাবে যিনি শিক্ষা দান করেন, সে তাঁহার ব্যবসাগত কর্তব্য বা নৈতিক কর্তব্য নয়; সে তাঁহার সাধনা। কারিগরেব কাজ অনেকটা সহজ। শিল্পী হইতে হইলে চাই অন্তরের প্রেরণা! ভিতরে প্রেরণা থাকাতেই সেটা সৃষ্টির ব্যাপার। কারিগর হইলে কাজ সহজে মিলে, নিজের কাজে আত্মার তুষ্টি ও সৃজন ক্ষমতার নিদর্শন পাওয়া যায় না— ফলে তাঁহার দ্বারা মানুষ তৈরি হয় না।

কি উদ্দেশ্যে কাজ করিব, কি পড়াইব, কেন পড়াইব এবং কেমন করিয়া পড়াইব—ইত্যাদি হইল শিক্ষার ফিলজফি অথবা দর্শন। এই প্রশ্নগুলির উত্তরের সঙ্গে আসিবে নিজের ব্যক্তিত্ব, এবং কি করিয়া নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারা যায়— ছাত্রের দিক হইতে এবং সমাজের দিক হইতে, সেই জ্ঞান।

শিক্ষাদান প্রকৃত পক্ষে সামাজিক ব্যাপার। ইহা ভুলিলে চলিবে না। প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্—আমেরিকার বিখ্যাত দার্শনিক জন্ ডিউঈ'র (John Dewey) মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলে আমার বক্তব্য বুঝা যাইবে:

The school is primarily a social institution. Education being a social process, the school is simply that form of community life in which all those agencies are concentrated, that will be most effective in bringing the child to share the inherited resources of the race and to use his own powers for social ends.

তাৎপর্য—স্কুল প্রকৃত পক্ষে সামাজিক প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা মূলত সামাজিক ব্যাপার। সরল ভাবে বলিতে গেলে, বিদ্যালয় দেশের—সমাজের—প্রতিকৃতি স্বরূপ। স্কুল হইবে ছাত্রের পক্ষে জাতীয় জীবনের নানাবিধ কর্মের আধার এবং ছাত্র ঐ সব বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া উত্তরাধিকার সূত্রে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে সামাজিক জীবনে।

জন ডিউঈ (John Dewey) বলেন:—Education is a process of living and not a preparation for future living—অর্থাৎ, শিক্ষালাভ জীবন-যাত্রার একটি উপাদান মাত্র; ভাবী জীবনের জন্য তৈয়ারী হওয়াকে শিক্ষা লাভ বলে না। এই ক্ষেত্রে দেখিতে হইলে বিদ্যালয়কে

সমাজের প্রতিচ্ছবি করিতে হয়। ছাত্রেরা বিদ্যালয়-সমাজে শিক্ষা পাইলে নিজেদের সমাজে—পূর্ণবয়স্কের সমাজে—স্থান করিয়া লইতে পারিবে। এই কথা বিশদ করিয়া বলিলে বলিতে হয়, কোন একদিন জলে সাঁতার দিব এই জন্য ডাঙ্গায় বসিয়া হাত পা নাড়ার মতো কোন কিছু করা বাতুলের কাজ। জন্ ডিউঈ বলেন—এখনই জলে নামিতে হইবে। স্কুলকে সমাজের প্রতিচ্ছবি কর, অর্থাৎ সমাজে যাহা আছে স্কুলে যেন তাহাই ছেলেরা পায়—কৃষি, সেবাশ্রম, মিউজিয়ম, ফ্যাক্টরি রঙ্গমঞ্চ, সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য, নৃত্য ইত্যাদি।

আধুনিক স্কুলে থাকিবে উৎসব, আনন্দের আয়োজন, জীবনের নানাবিধ কর্মের পক্ষে প্রকৃত শিক্ষা; থাকিবে সৃষ্টি করিবার অদম্য উৎসাহ আর পুরাতন হইতে, কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইবার জন্য নূতন কিছু করিবার প্রয়াস। কিন্তু আজিকার বিদ্যালয়ে জীবন নাই—জীবনের ফিলজফি নাই। পুঁথির বেড়াজালের উপর—কর্তার ইচ্ছায় কর্ম—এই পদ্ধতিতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত।

তিন বৎসর পরে—বড় জোর তিন ঘণ্টার জন্য, বিভাগীয় ইন্স্পেক্টর মহোদয়ের নিয়মবদ্ধ পরিদর্শন। তাহা দ্বারা স্কুলের জাতি নির্ণয় হয় না। ব্যবসা বুদ্ধি এবং পাটোয়ারী বুদ্ধির কতটা স্কুল পরিচালনার মধ্যে আছে, তাহা অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়। প্রধান শিক্ষক ব্যতীত অন্য শিক্ষক মহাশয়দিগের সহিত আলাপ পরিচয়ের নাম গন্ধ নাই। কোন্ পাঠ কি রকম দিতে হইবে

তাহার নমুনা (Demonstration) মাত্রও দেখান হয় না। একবার এই নাম মাত্র পরিদর্শন হইয়া গেলে স্কুল আবার তিন বৎসরের জন্য নিশ্চিন্ত।



আমাদের দেশে বহু পরিবারেই নিয়ম শৃঙ্খলা (Discipline) বলিয়া কোন জিনিস নাই। খাওয়া-পরা, কাজকর্ম, আমোদ প্রমোদ—কোনটাই নির্দিষ্ট সময়ে করা হয় না। অনাবশ্যক কথাবার্তা, নিরর্থক চীৎকার, ছেলে মেয়ের কোলাহল ও ক্রন্দন —এই লইয়াই আমরা আছি। এই সব অনিয়ম আমাদের গা সহা হইয়া গিয়াছে। কিছুতেই অস্বস্তি বোধ আমরা করি না। পরিবার এইরূপ হইলে কেহই শান্তি পায় না। হট্টগোলের মধ্যে ছেলেমেয়ের লেখাপড়াও কিছু মাত্র অগ্রসর হয় না। ফলে আমরা অদৃষ্টের দোষ দিই। অদৃষ্টের দোষ দেওয়া সহজ। যে কোন দুর্ভাগ্যেই আমরা সেটা করি—মনকে প্রবোধ দিই। কিন্তু লোক চক্ষে পরিবারকে ভদ্র বলিয়া অভিহিত করার চেষ্টা মাত্র করি না।

উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থায় শিশুকে রাখ, তাহার শিক্ষা আপনিই হইবে। মন্টিসরির ইহাই সার কথা। যখনই আমরা গৃহ এবং বিদ্যালয়ের দিকে তাকাই তখনই আশার আলোক দেখিতে না পাইয়া মন অবসন্ন হয়। গ্রামে এমন বাড়ি খুব কম আছে, যেখানে ছেলে মেয়েরা মনের খোরাক পায়। বিশ্রী আবহাওয়ার মধ্যে—অষ্ট প্রহর তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের মধ্যে আমাদের

ছেলে মেয়েরা অযত্নে বর্দ্ধিত। এই বিষয়ে নবীনদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

প্রত্যেক স্কুলে এমন শিক্ষক খুব কম আছেন, যিনি অম্লান চিত্তে বলিতে পারেন—শিক্ষাদান আমার জীবনের ব্রত। শাস্ত্রে বলে, "সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে"—সেই হইয়াছে বিদ্যা, যাহা ছাত্রকে মুক্তি দিবে। এই মুক্তি হইল, মনের মুক্তি—অশিক্ষা থেকে, কুশিক্ষা থেকে, ধর্মান্ধতা থেকে। তবেই যিনি শিক্ষক, তিনি মুক্তিদাতা।

স্কুল ইন্‌স্পেক্টর ডক্টর মাইকেল ওয়েষ্ট্ কথায় কথায় একদিন আমাকে বলিলেন—"তোমাদের দেশে এক অদ্ভুত ব্যাপার; সব জাতের ছেলেই স্কুলে পড়ে। অভিভাবকেরা চাহেন তাঁহাদের ছেলেরা যেন কলম হাতে করিয়া চেয়ারে বসিয়া টাকা উপার্জন করে। ঘরের বাহিরে কাজ করিতে সকলেই নারাজ। তোমাদের দেশে শিল্প নাই বলিলেই চলে। ইংলণ্ড এই রূপ দেশ নহে। ইংলণ্ড গির্জা ও সিনেমার দেশ নহে—কিন্তু ফ্যাক্টরির, কারখানার দেশ। লোকে কাগজে লিখিয়া নহে, কিন্তু কায়িক পরিশ্রম দ্বারা বেশি টাকা রোজকার করে। ভুয়া ভদ্রতা শিক্ষা দিও না! জগতের দিকে তাকাও।"

আজ বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলনের সহিত লোকের দৃষ্টিকোণ বদলাইয়া যাইবার কথা। কিন্তু আমাদের দেশ এক অদ্ভুত দেশ! লোকে বিজ্ঞানে এম্, এস্‌সি. পাশ করিয়াও এমন ভাবে কুসংস্কার মানিয়া চলে যেন, কোন দিন বিজ্ঞান পড়ে নাই।

শিক্ষকতাকালে কত ছাত্রকে বুঝাইয়াছি—সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ রাহু নামক কোনও রাক্ষসের ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টায় সূর্য ও চন্দ্রকে গলাধঃকরণের ফলে সংঘটিত হয় না এবং হরি সঙ্কীর্তনে সূর্য ও চন্দ্রকে ছাড়িয়া দেওয়ার ফলেই তাহাদের মুক্তি হয় না ; উহা কল্পনাপ্রসূত এবং মিথ্যা। পৃথিবী, সূর্য আর চন্দ্র আপন আপন কক্ষে নিয়ত ঘুরিতেছে। এইরূপ ভ্রাম্যমান অবস্থায় পৃথিবীর ছায়া চন্দ্র অথবা সূর্যের উপর পড়িলেই উহার অংশ বিশেষ ছায়ায় ঢাকা পড়ে এবং যে পরিমাণ ঢাকা পড়ে, তাহাই আংশিক বা পূর্ণ গ্রহণ রূপে দেখা যায়। ইহাই চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

ছাত্রেরা ইহা বুঝিল এবং মানিয়া লইল। কিন্তু গ্রহণের সময় ঘরে ঘরে শঙ্খ বাজিয়া ওঠে এবং খোল করতাল সহ কীর্তণ আরম্ভ হয়। তখন ছেলেরা—সত্যের, বিজ্ঞানের পূজারীরা, সকল শিক্ষা জলাঞ্জলি দিয়া দলে ভিড়িয়া পড়ে। বিজ্ঞান শিক্ষা যদি সত্য দৃষ্টি না শিখায়—কুসংস্কার দূর না করে, তবে আর আমাদের ভরসা কি ?

আমি অশিক্ষিত নিরক্ষর লোকের কথা বলিতেছি না। কারণ জনশ্রুতি, দেশাচার এবং লোকাচারই তাহাদের ধর্ম। যুক্তির দ্বারা সত্য মিথ্যা নির্ণয় অথবা বিচার করিবার মত শিক্ষা তাহাদের নাই। একজন এম্. এ. পাশ লোক গ্রহণের সময় তাঁহার বাড়ির সব ছেলেকে লেপের নীচে শুইয়া থাকিতে বাধ্য করিলেন—পাছে গ্রহণ দেখিয়া কোন গ্রহের কোপদৃষ্টিতে পড়ে !

নবীনেরা ভাবিয়া দেখুন—কত ছাত্র আছে যাহারা প্রকৃতির প্রধান দৃশ্য সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখে নাই। কত ছাত্র আছে যাহারা কোনও বড় মাঠের ধারে ও নদীর তীরে দাঁড়াইয়া তাহার সৌন্দর্যে মোহিত হয় নাই এবং পাখীর কলরবে কোন আমোদ পায় নাই। বাংলার উন্মুক্ত আকাশের নীচে বাংলার নদী, বন, মাঠ, শষ্যক্ষেত্র ও পল্লী জীবন। প্রকৃতির শোভা দেখা শিক্ষার প্রধান সহায়। পল্লী ভ্রমণ এবং দেশ ভ্রমণ, প্রকৃতির শোভা দেখা কি স্কুলের কর্মলিপির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না?

মনে পড়ে, ১৯১০ খৃষ্টাব্দে হেলির ধূমকেতু দেখিবার জন্য শিক্ষক মহাশয়দের ও ছাত্রদের লইয়া উন্মুক্ত মাঠে রাত্রির শেষ অংশ দিনের পর দিন দূরবীণ হাতে কাটাইয়াছিলাম। শান্তি-নিকেতনের বিজ্ঞানী জগদানন্দ রায় মহাশয়ের সহিত ছাত্রদের পত্র-যোগ ছিল। সে বিষয় এখন মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে। বাবুরহাটের ছাত্রদের পক্ষে ঐ বৎসরের স্মৃতি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিং-কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু এম. এ. মহোদয় যখন শান্তিনিকেতনে শিক্ষক ছিলেন তখন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বিদেশ হইতে তাঁহাকে নিম্ন লিখিত চিঠি লিখিয়াছিলেন—"অনাথ, বাংলা শিক্ষার ভিতর দিয়ে ছেলেদের মনকে জাগাবার রাস্তা যত প্রশস্ত এমন আর কোনো উপায় নাই। ইংরেজি বই থেকে মনের খোরাক পাবার অবস্থায় পৌঁছিতে দেরি হইবে। কিন্তু বাংলা থেকে প্রতিদিনই যেন

ওদের মন খাদ্য পায়। যা ওদের নির্দিষ্ট পাঠ তারই মধ্যে যেন ওরা বদ্ধ না থাকে—বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব ইতিহাসের বিচিত্র বিষয়, নানা স্থান থেকে সংগ্রহ করে তাদের মনের ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলো। বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল থেকে বাঁধা খোরাকে অভ্যস্ত হই বলে, আমাদের মনন-শক্তির সজীবতা হারাই—বুদ্ধির ক্ষেত্রে নিজে চরে খাবার অভ্যাস যারা না করে, তাদের চিত্ত কোন কালে সবল হয় না।"

অনেক দিন পূর্বেই এই উদ্দেশ্যে—"বুদ্ধির ক্ষেত্রে নিজে চরে খাবার অভ্যাস" করিবার জন্য, বাবুরহাট স্কুলে "আলোচনা পরিষদ" সৃষ্টি করিয়াছিলাম। এখনও ঐ আলোচনা পরিষদ আছে, কিন্তু নির্জীব অবস্থায়। কোন ছাত্র ইচ্ছা করিয়া তাহাতে যোগ দেয় না। কারণ, ইহার কার্যপ্রণালীর কোন আকর্ষণ নাই। বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষাকেই প্রধান আসন দিয়াছেন। যে স্কুল বাংলা ভাষার অধ্যাপনায় কৃতিত্ব দেখাইবে, সেই স্কুলই ভাল বলিয়া গণ্য হইবে। স্কুলের ছেলেরা বাংলা ভাল করিয়া পড়িবে, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। কোন কোন বৎসর বাংলায় খুব ভাল ফল হইত। ছেলেদের এইরূপ কৃতিত্বে আমরাও ধন্য হইতাম।

বাংলার শিক্ষক বহু বাংলা বই ও মাসিক পত্র পড়িবেন এবং প্রেরণা দিবেন ছাত্রগণকে। ছাত্রদের ডায়েরি লিখিতে আদেশ দিলে ভাল হয়। রোজ লিখিবার দরকার নাই। সপ্তাহে দুই দিন যাহা দেখে ও শোনে তাহা ডায়েরির অন্তর্ভুক্ত করিলেই

চলে। বাংলা লিখিতে হাতের জড়তা কমাইবার প্রধান উপায়—ডায়েরি লিখা।

আলোচনা পরিষদে নূতন জীবনীশক্তি সঞ্চার করিয়া উহাকে আকর্ষণের বস্তু করিয়া তুলিতে হইবে। উহার কর্মনীতির মধ্যে সঙ্গীত ও অভিনয়, ছাত্রদিগকে দুই পক্ষে ভাগ করিয়া তর্কবিতর্ক, ভাল উচ্চারণে বাংলায় বক্তৃতা ইত্যাদি ঢুকাইয়া দিলে মন্দ হয় না। সম্ভব হইলে আলোচনা পরিষদ হইতে হস্তলিখিত মাসিক পত্র বাহির করিলে ভাল হয়।

বয়সের সঙ্গে শরীরের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু মনের শক্তি বৃদ্ধি হয় কি না পরীক্ষা করা উচিত। নতুবা এমন হইতে পারে, পূর্ণ বয়স্কের মন শিশুর মনের মতো দুর্বল। এই জন্য দরকার নানা বিষয়ের প্রশ্ন করা ও তাহার উত্তর প্রদান। বিবিধ বিষয়ের উত্তব প্রদান করিলেই শিক্ষক মহাশয়দের নানা গ্রন্থ পড়িতে হয়। নতুবা অধীত বিদ্যার ফলে শিক্ষকতা করিলে—যিনি যত বিদ্বানই হউন না কেন—আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর ব্যতিক্রম হইবে। কয়েকটি আদর্শ প্রশ্ন নিম্নে লিখিতেছি। ইচ্ছা করিলে অভিভাবক শ্রেণীও বাড়ির ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

১। পাখী, জন্তু, বৃক্ষ ও মানুষের মধ্যে কে বেশি বাঁচে এবং কেই বা পূর্বজ?

২। সূর্যের উপকারিতা কি? বৃষ্টি না থাকিলে জগতের কি অপকার হইত?

৩। সহরের উৎপত্তি কি কি কারণে হয় এবং কেনই বা তাহাদের অবনতি ঘটে ?

৪। একটা দেশের "গবর্ণমেণ্ট" বলিতে তুমি কি বোঝ ?

৫। সামাজিক কোন্ কোন্ প্রথা তোমার নিকট অযৌক্তিক মনে হয় ?

৬। চাকরি ও ব্যবসা—কোন্‌টি ভাল যুক্তিসহ বল।

৭। মেঘশূন্য আকাশ নীল কেন ? মেঘ কি জিনিস ?

৮। বজ্র ধ্বনি কিসে হয় ? বজ্রপাতের সময় কি কি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ?

৯। অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন লোক বর্ত্তমানকালে ফিরিয়া আসিলে কি কি প্রধান পরিবর্ত্তন দেখিবেন ?

১০। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের পরিচয় দাও এবং কি জন্য প্রসিদ্ধ বল :—১। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ; বুকার ওয়াসিংটন ; শ্রীযুক্তা বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত ; স্যার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; স্বামী বিবেকানন্দ ; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু।

১১। বাষ্প ও তাড়িৎ শক্তি মানুষ কি কি কাজে লাগাইয়াছে ?

১২। নাম কর :—(বঙ্গের) প্রথম সিভিলিয়ান ; প্রথম র‍্যাঙ্‌লার ; প্রথম পুরুষ ও স্ত্রী গ্রাজুয়েট ; প্রথম বিধবা বিবাহের পাত্র-পাত্রী ; প্রথম সংবাদ পত্র ; অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রথম গ্রন্থ।

১৩। উনানে ফুঁ দিলে আগুন জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু প্রদীপে

ফুঁ দিলে তাহা নিবিয়া যায় —একই ক্রিয়ার বিভিন্ন ফল হয় কেন ?

১৪। কোন্ কোন্ দেশের লোক খাদ্য বস্তু আমাদের মত হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া খায় না ?

১৫। নিম্নলিখিত বইগুলির গ্রন্থকারের নাম বল :— (ক) বিসর্জন ; (খ) কুরুক্ষেত্র ; (গ) বৃত্রসংহার ; (ঘ) আলালের ঘরের দুলাল ; (ঙ) প্রভাত চিন্তা ; (চ) নারীর মূল্য ; (ছ) পথের পাঁচালী ; (জ) পারিবারিক প্রবন্ধ ; (ঝ) আলো ও ছায়া ; (ঞ) বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য।

১৬। তুমি লেখা পড়া শেষ করিয়া কি করিবে— বল।

১৭। গরু শুইবার সময় এবং শয়নাবস্থায়, দাঁড়াইবার সময় যাহা করে—চিত্র দ্বারা প্রকাশ কর।

১৮। বঙ্গদেশের জীবিত অথবা মৃত মনস্বী লোকদিগের মধ্যে তুমি কাহাকে বেশি মান্য কর এবং কেন ?

১৯। বিশদ রূপে বলিয়া যাও :—তোমার জীবনের—(ক) অতি সুখের দিন ; (খ) অতি দুঃখের দিন।

২০। আমাদের দেশে গ্রামের অর্থনৈতিক ভিত্তি কি ? অর্থাৎ লোকে টাকা পয়সা কোথায় পায় সংসার করিবার জন্য ?

২১। নিম্ন লিখিত কবিতার অর্থ বল :—

যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে,
সহস্র শৈবাল দাম বাঁধে আসি তারে ;

যে জাতি জীবন হারা, অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।
সর্বজন সর্বক্ষণ চলে যেই পথে,
তৃণ গুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোন মতে ;—
যে জাতি চলেনা কভু, তারি পথ 'পরে
তন্ত্র-মন্ত্র-সংহিতায় চরণ না সরে! স্বদেশ।

এমন দিন ছিল, যখন বাবুরহাটের ছাত্র মাসিক পত্রে— 'ভারতী', 'প্রবাসী', 'প্রকৃতি', 'মুকুল' এবং 'সোপানে' প্রবন্ধ লিখিতেন। সেই সব ছাত্রের মধ্যে কেহ কেহ সাংবাদিক হইয়াছেন এবং শক্তি অনুসারে বাংলা সাহিত্যের সেবা করিতেছেন। আবার সে দিন ফিরিতে পারে, যদি স্কুল কর্তৃপক্ষ বোঝেন বাংলার ক্লাশ—বাংলা সাহিত্যের ক্লাশ। বাংলা শিক্ষকের পদে বাংলা সাহিত্যে এম. এ. পাশ লোক নিযুক্ত করিলে ভাল হয়।

যিনি বাংলার অধ্যাপনা করেন তাঁহার হাতের কাছে নিম্ন লিখিত বই থাকা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি :

১। চলন্তিকা (অভিধান)।
২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বাংলার বানান—(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত)।
৩। গীতাঞ্জলি।
৪। বাংলাভাষা পরিচয় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত)।
৫। সাহিত্যের পথে—রবীন্দ্রনাথ।
৬। বাংলা শব্দ তত্ত্ব ঐ

৭। বাংলা সাহিত্যের নবযুগ—অধ্যাপক, ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত এম. এ; পি. আর. এস্.।

৮। বাংলা গদ্যের চারি যুগ—অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ এম্, এ, পি, এইচ্, ডি।

৯। বাংলা সাহিত্যের খসড়া—অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী।

১০। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—৺দীনেশচন্দ্র সেন।

যে ছাত্র সম্বন্ধে শিক্ষক কিছুই জানেন না অথবা অল্পই জানেন, সে-ছাত্র ঐ শিক্ষকের দ্বারা কোন উপকারই পাইতে পারে না, ইহা ধ্রুব সত্য। প্রত্যেক ছাত্র সম্বন্ধে শিক্ষকের সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কেবল নাম জানিলে চলিবে না। কি আবেষ্টনে সে বর্দ্ধিত তাহাও জানিতে হইবে। উহার সহায়রূপে স্কুলের প্রত্যেক ছাত্রের একটা রেকর্ড থাকা প্রয়োজন। আমার বিবেচনায় নিম্নলিখিত রূপ তালিকা করিলে ভাল হয়। অভি-ভাবকশ্রেণী ইচ্ছা করিলে নিজের বাড়ির ছেলেদের জন্য ছয় মাস অন্তর এই ফরম্ পূর্ণ করিতে পারেন।

১	২	৩	৪	৫	৬
ওজন	দাঁতের অবস্থা	পরিচ্ছন্নতা আছে কি নাই	উচ্চারণ ভাল কি মন্দ	পড়ায় কোন্ কোন্ বিষয়ে ভাল	স্কুলের নির্দ্দিষ্ট কাজ নিয়মিত দেখায় কি না।

৭	৮	৯	১০	১১	১২
সাহসী কি ভীরু	চট্‌পটে কি অলস	ন্যায় অন্যায় বোধ আছে কি নাই	স্বভাব শান্ত কি ঝগড়াটে	ইতর প্রাণীর প্রতি ব্যবহার নিষ্ঠুর কি দয়া প্রবণ	নিয়মিত খেলে কি না

১৩	১৪	১৫	১৬
দৈনিক ও মাসিক পত্র পড়ে কি না	ধূম পান করে কি না	ভদ্রতা ও বিনয় আছে কি নাই	প্রধান শিক্ষকের মন্তব্য

শিক্ষকতা সকলের চাইতে গৌরবের কর্ম ; কিন্তু ব্যবসায় রূপে ইহা নিকৃষ্টতম। যাঁহারা স্বেচ্ছায় শিক্ষকতা অবলম্বন করেন তাঁহাদের পক্ষে ইহার অপেক্ষা আনন্দদায়ক আর কিছু নাই। পরন্তু যাঁহারা দায়ে পড়িয়া—জীবিকা নির্বাহের জন্য, শিক্ষক হন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা হেয় দাস্যবৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেবলমাত্র জীবিকা নির্বাহ করিবার জন্য তো মনুষ্যত্ব নয় ? জীবিকাকে অতিক্রম করিয়াই মানুষের সভ্যতা।

শিক্ষকতা বাস্তবিক সন্ন্যাসীর কাজ। সংসারের দিকে যে শিক্ষক যত মন দিবেন, শিক্ষকতার দিক হইতে তাঁহার ততটা বিচ্যুতি ঘটিবে। বাহিরের লোক এবং স্কুলেও বুদ্ধিমান ছাত্রেরা কোন শিক্ষকের সংসারীর প্রতি কি রকম আগ্রহ এবং কোনও

বিষয়ে প্রেরণা (Inspiration) দিতে পারেন কি না—এই বিবেচনায় শিক্ষকের যোগ্যতা বিবেচনা করেন।

হাইকোর্টের বিচারপতি পরলোকগত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"পৃথিবী হইতে সূর্য কত দূরে ?" ছেলেটি উত্তরে বলিল—৯ কোটি ২৯ লক্ষ মাইল। পরে প্রশ্ন হইল—' পৃথিবী তোমা হইতে কত দূরে ?" ছেলেটি উত্তর করিতে পারিল না। জানিবার প্রবল ইচ্ছা এবং অনুসন্ধিৎসাই জ্ঞান লাভ করিবার প্রধান উপায়। ইংলণ্ডের পরলোকগত কবি ও শক্তিশালী লেখক রুডিয়ার্ড কিপ্‌লিং নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"আমার ছয় জন খুব বাধ্য ভৃত্য আছে। আমি সর্বদাই তাহাদের সাহায্য লই। তাহাদের নাম—কি, কেন, কখন, কি রূপে, কোথা হইতে এবং কাহারা।" কিপ্‌লিং যে ছয় জন ভৃত্যের নাম করিলেন, তাহারা সর্বজনীন দাস বা চাকর। কিন্তু সকলে উহাদের খাটাইতে পারে না বলিয়া উহাদের সেবা লাভে বঞ্চিত হয়।

১৩৩৮ সনের নিখিল-ভারত-শিক্ষা-সম্মেলনে খোলা মাঠে ক্লাশ করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে এই রূপ ব্যবস্থা হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু শীতপ্রধান দেশ বিলাতে এবং আমেরিকায়ও ঐ ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে বিশ্বভারতীতে—শান্তিনিকেতনে—অধ্যাপক, ছাত্র-ছাত্রীদের থাকিবার ও আহারের ব্যবস্থা পাকা বাড়িতে। কিন্তু ক্লাশ বসে আম্রকুঞ্জে এবং শালবনে। অধ্যাপক ও শিক্ষকের জন্য কোন চেয়ার বা টেবিল

নাই। ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য টুল, ডেস্ক্ কিছুই নাই। কলেজ এবং স্কুলে মাটির আসনে বসিয়াই সকল সময়ে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা চলিতেছে। কঙ্করপূর্ণ বালি, ঝাড়িলেই পড়িয়া যায়। খুব বৃষ্টির দিনে সিংহ সদনে ও লাইব্রেরীর বারান্দায় ক্লাশ বসে। টিনের ঘর অস্বাস্থ্যকর। শিক্ষক মহাশয় ইচ্ছা করিলে বাহিরে ক্লাশ করিয়া দেখিতে পারেন। আমি মাঝে মাঝে গাছের নীচে ক্লাশ করিতাম। ছেলেরা তাহাতে শান্তি পাইত।

সুশিক্ষক হইতে হইলে প্রচুর পরিমাণে অধ্যয়ন করিতে হয়। সুনিয়ন্ত্রিত ছাত্রের ন্যায় অধ্যয়ন করিতে বিরত হইলে শিক্ষকেরই শিক্ষা ফলোপধায়ক হইবে না। তাঁহাকে নিত্য নতুন জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে। নিয়োগ করিবার পূর্বেই শিক্ষকের পাঠস্পৃহা আছে কি না, দেখা দরকার। শিল্পী বা কারিগর কিনা ইহা জানিলে আরও ভাল।

পুরাতন পুঁজিপাটা লইয়া অন্য কাজ চলিতে পারে, কিন্তু শিক্ষকতা চলেনা। শিক্ষক হইয়া যে ব্যক্তি পূর্ব সংগৃহীত বিদ্যাবলে কাজ চালাইয়া যান, দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে, নিশ্চয়ই তিনি বালকগণকে ফাঁকি দিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ এবং নিজের পরকাল নষ্ট করেন। এই জন্য আবশ্যক বহু গ্রন্থপূর্ণ লাইব্রেরী। আমাদের দেশে অধিকাংশ স্কুল শ্রীহীন এবং অনেক স্কুলে উপযুক্ত লাইব্রেরীও নাই। শ্রীহীন ও লাইব্রেরীশূন্য বিদ্যালয় হতভাগ্য ছাত্রেরই জন্মভূমি।

যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ দেশের লোককে দুর্নীতিপরায়ণ করিয়াছে, যে কোন উপায়ে টাকা পয়সা সংগ্রহের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে। দেশের এই নিন্দনীয় আবহাওয়ার বিরুদ্ধে চলিবার ক্ষমতা ছেলেদের নাই। ইহার ফল হইবে অতি বিষময় সমস্ত বঙ্গদেশের পক্ষে। অর্থ উপার্জন ভবিষ্যৎ পুরুষেও সুনীতি সহকারে হইবে না। এই বিষয় আমাদের চিন্তনীয়।

তেরোশ পঞ্চাশের মনুষ্যকৃত দুর্ভিক্ষে বঙ্গদেশে কত জীবন হানি হইল। গৃহহীন, অন্নহীন, বস্ত্রহীন নরনারী, শিশু ও বৃদ্ধকে মুক্ত আকাশের তলে মৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছে। যাহারা বাঁচিয়াছে তাহাদের বিন্দু বিন্দু রক্ত কাগজের নোট রূপে ব্যবসায়ীর ব্যাঙ্কে জমা হইয়াছে। এমন নির্মম ব্যাপার কেহ চক্ষে দেখে নাই। সমস্ত দেশ মানুষকে ফাঁকি দিবার কৌশলের চর্চা করিতেছে। চোরা বাজার দেশের সর্বত্র। দেশ মনে করিতেছে, এই দুর্নীতি-পরায়ণতার দ্বারা সঞ্চিত অর্থ ভবিষ্যৎ পুরুষের ভোগে আসিবে। কি ভুয়া আদর্শ! নরকের সিংহদ্বার খুলিবার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"ধর্ম কি পুঁথির মন্ত্রে, দেবতা কি মন্দিরের প্রাঙ্গনে? মানুষকে যারা ফাঁকি দেয়, তাহাদের দেবতা কি কোন স্থানে আছে?" তিনি একটি শ্লোকে দেশের এই অবস্থা ভাল রূপ চিত্রিত করিয়াছেন:—

"কর্মেরে করেছে পঙ্গু নিরর্থ আচারে,
জ্ঞানেরে করেছে হত শাস্ত্রকারাগারে;

তব সত্য তব গান রুদ্ধ হয়ে রাজে
রাত্রিদিন জীর্ণ শাস্ত্রে শুষ্কপত্র মাঝে।

"স্বদেশ"

আমাদের শিক্ষায়, দীক্ষায়, সমাজের ব্যবহারে, কোথাও বৃহৎ ত্রুটি আছে। তাহা না হইলে এমন ব্যাপার হয় না। গুরু, পুরোহিত—কাহারও দ্বারাই আমাদের ইহকালের ও পরকালের উপকার হইতেছে না। দিনের কাজ করিয়া যাইতেছি, কিন্তু তাহার দোষ, ত্রুটির দিকে মন নাই। উপাস্য দেবতাকে স্মরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথের এই কথা হৃদয়ের বলের সহিত প্রতি সন্ধ্যায় বলিতে পারিতেছি না :—

"আমার বিচার তুমি, কর তব আপন করে,
দিনের কর্ম আনিনু তোমার বিচার ঘরে।" "ব্রহ্ম সঙ্গীত"

আমরা শয়তানের নিকট আত্মা বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছি। পরমেশ্বরের "বিচার ঘরে" "দিনের কর্ম" আনিবার আমাদের সাহস কোথায়?

মনন ক্রিয়া আমাদের মধ্যে নাই। সুতরাং—

আপনারে শুধু বড় বলে জানি,
করি হাসাহাসি, করি কানাকানি,
কোটরে রাজত্ব, ছোট ছোট প্রাণী
ধরা করি সরা জ্ঞান। "স্বদেশ"

কবি গুরুর এই কবিতাই আমাদের অবস্থা স্মরণ করাইয়া দেয়।

গুরু পুরোহিত যাঁহারা আছেন তাঁহাদের দৃষ্টি কেবল প্রাপ্তির দিকে। শিষ্য বা যজমান সৎপথে টাকা উপার্জন করিয়া তাহাদের প্রাপ্য দেয় কি না, ইহা তাঁহাদের দেখিবার প্রয়োজন নাই। তুমি যে কোন প্রকারে অর্থ উপার্জন কর ; তুমি নীচ, বঞ্চক, কৃপণ, মিথ্যাবাদী-যাহা ইচ্ছা হইতে পার। তোমার প্রতিবাসীরাও তোমারই মতো।

আমাদের দেশে নীতি শিক্ষকের অভাব নাই। বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণের দেশে, রাম, শ্যাম, যদু—সকলেরই শিক্ষা পরলোকের হিতের জন্য। ইহলোকে সংসারী হইয়া কি করিয়া সৎপথে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করা যাইতে পারে, কিরূপে স্ত্রী পুত্র সুস্থ ও সবল হইতে পারে, দীর্ঘজীবী হইয়া ধনী, কর্মী ও হিতকামী হইতে পারে—এই সকল তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া তাঁহারা আলোচনা করেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন—"যে ভগবান পৃথিবীতে খাইতে দিতে পারেন না, তিনি পরলোকে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন, তাহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করি।"



এই জগতে কিছুই স্থির নহে। প্রতি মুহূর্তে সবই পরিবর্তনশীল—হয় উন্নতির দিকে, না হয় অবনতির দিকে। মানুষ কাল যেখানে ছিল, আজ আর সেখানে নাই। বাহিরের সমাজ হুড়মুড় করিয়া গায়ের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ট্রেন, ষ্টীমার, যান্ত্রিক যান বাহন, সিনেমা, রেডিও, ইলেক্‌ট্রিসিটি—সর্বশেষ পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের পরিণাম এবং পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে যাহাদের

মনোভাবের বিপ্লব ঘটে নাই তাহারা অন্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন, তৎফলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জীবন যাপনের প্রয়াস, শিল্পের প্রসার, দেবপূজায় ভক্তি অপেক্ষা তামাসা ও আমোদ উপভোগের চেষ্টা এবং সর্বোপরি সিনেমা—যাহা হিতকারী প্রতিষ্ঠানগুলির ও ধর্মসমাজের লোপ সাধন করিতেছে—লোকের জীবনে প্রলয় আনিবে।

সর্বজনীন পূজা, গৃহস্থ বাড়ির কালীপূজা, দুর্গাপূজা ও সরস্বতীপূজা ব্রাহ্মণেতর জাতির দ্বারা হইতেছে—সব জেলাতেই। এই পরিবর্তন হিন্দু সমাজ বারণ করিতে পারিতেছেন না। এই পরিবর্তন ব্রাহ্ম সমাজ বা আর্য সমাজের দ্বারা হয় নাই। হিন্দুরা নিজেই করিতেছেন। জাতিভেদ হিন্দু সমাজের মধ্যেই ভাঙিয়া পড়িতেছে। সুতরাং জাতিভেদহীন হিন্দু সমাজ এখন সকলেরই কল্পনায় আসিতেছে। এবং সে কল্পনায় দোষ নাই।

সামাজিক বৈষম্যের কথা উঠিলে যে কোন উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু বলিয়া উঠিবেন—"যত্র জীব তত্র শিব"; "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" কিন্তু মানুষকে কি চক্ষে আমরা দেখি তাহা নিম্নলিখিত কাহিনী হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

এক বৈঠকে গত দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার জেলের মৃত্যু সম্পর্কে কথা হইতেছিল। একজন ব্রাহ্মণ বলিলেন—"জেলেরা হাজারে হাজারে মরবে না কেন? রোজ এত প্রাণী বধ করার ফল ফলিয়া গেল।" তখন শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলিল—

"আপনি কি নিরামিষাশী" ? তিনি বলিলেন—'না'। তখনই হাসির রোল পড়িল। তিনিও চুপ করিলেন।

বয়স্ক মেয়েদের ভিতর উত্তরোত্তর স্বয়ম্বর প্রথা ঢুকিতেছে। শিক্ষিতা-মেয়েকে তাঁহার অনিচ্ছায় পিতামাতা বিবাহ দিতে পারেন না। যাঁহারা সংবাদ-পত্র নিয়মিত পড়েন, তাঁহারা জানেন প্রতি মাসে বঙ্গদেশে কত যুবক যুবতীর বিবাহে কত ঘটনা হইতেছে। যে সব মেয়ে কলেজে পড়েন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের বিশেষ প্রিয়জনকেই বর রূপে পছন্দ করেন,—অনেক ঘটনায় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। সেই মনোনয়নে জাতি বিচার থাকে না। এইরূপ বোধ হইতেছে, শিক্ষিতা মেয়েরাই জাতি ভেদ উঠাইয়া দিবার প্রধান সহায় হইবেন। রাজা রামমোহন রায় এবং মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতী যাহা পারেন নাই, তাহা হিন্দুসমাজের শিক্ষিতা মেয়ের দ্বারাই হইবে বলিয়া মনে হয়।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন :—"এখন আমাদের দেশে তিন শ্রেণীর লোক স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন। এক শ্রেণীর লোক বলেন—পশ্চাতের দিকে চল; যাহা কিছু নূতন, যা কিছু পরিবর্তন তাহাই নিন্দনীয়। অতএব প্রাচীনের দিকে চল, বৈদিক সময়ের দিকে চল। আর একদল বলিতেছেন—সমাজে যাহা আছে তাহাই ভাল, তাহাই রক্ষা কর, পরিবর্তন আনিও না। নারীদিগকে অবরোধেই রাখ; তাহাদিগকে লেখা পড়া শিখিতে দিওনা। তৃতীয় দল বলিতেছেন—চল, চল,

দাঁড়াইবার সময় নাই, স্থান নাই। অতীতের যাহা ভাল তাহা রাখ, কিন্তু ভবিষ্যতের দ্বার রুদ্ধ করিও না।"

ইহার মধ্যে কোন্ দলে নবীনেরা থাকিবেন নিজেরাই পছন্দ করুন।

পল্লীর রক্ষণশীল সমাজ ভাঙিয়া গিয়াছে। আমরা নিয়ম শৃঙ্খলা বিহীন, গতানুগতিকের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মন, প্রবৃত্তি ও রুচি লইয়া বিংশ শতাব্দীতে বাস করিতেছি। সনাতন জাতি ভেদ, শ্রেণী ভেদ, বংশ গরিমা ইত্যাদি অর্থহীন অতীতের ভূতাতঙ্কে আচ্ছন্ন হইয়া উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদের জীবন যাত্রা আমাদের ইচ্ছা শক্তিতে চালিত হয় না। ধাবমান কাল আমাদিগকেও ঠেলিয়া ঠেলিয়া গতিশীল করিয়া রাখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কথায়ঃ—

আমরা আছি হাজার বছর ঘুমের ঘোরের গাঁয়ে,
ভেসে বেড়াই স্রোতের শেওলা ঘেরা নায়ে।

যে ভাবে এত দিন চলিয়াছে, সেই ভাবে চলিলে আমরা বাঁচিতে পারিব না। আজ আমাদের কর্ম্মপন্থা ও সমাজ ব্যবস্থা বদলাইতে হইবে। এই যুগের উপযোগী আর একটা নূতন পন্থা যদি আমরা আবিষ্কার করিতে না পারি তাহা হইলে আমরা আত্মরক্ষা করিতে পারিব না। নূতন ভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করিয়া সমাজকে গঠন করিতে হইবে। আমাদের ব্যবস্থা মধ্য যুগীয়। সে ব্যবস্থা আজ টিকিতে পারে না।

প্রকৃতির উপর আধিপত্য করিতে পারে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান

শিক্ষার ভিতর দিয়া সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে। গ্রামে বসিয়া চরকা চালাইয়া, পুরাতন লাঙ্গলে চাষ করিয়া, সরল ভাবে জীবন কাটানো এখন আর সম্ভব নয়। বড় বড় কারখানা গড়িতে হইবে। গ্রামগুলি সহরে পরিণত করিতে হইবে। জন সাধারণকে সঙ্গে না লইয়া আমরা কিছুই করিতে পারিব না। আমাদের শতকরা পঁচাত্তর জন অস্পৃশ্য। তাহাদিগকে দূরে রাখিয়া আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থা অসম্ভব। বিশ্বকবির অমর বাণী যেন নবীনেরা স্মরণ রাখেন:—

মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে, তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে, তাহাদের সবার সমান!

"গীতাঞ্জলি"

আমাদের সেই অপমানের দিন আসন্ন। এখন নিজেদের সামলাইতে হইবে।

● ✱ ● ●

ছাত্রদিগের সহিত আমার সম্পর্ক অব্যাহত আছে। আমি তাহাদিগকে ভালভাবেই জানি। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা ছাত্রদের মধ্যে বড়ই কম। ছাত্ররা নির্জীব। কোন বিষয় জানিবার কৌতূহল নাই। সুতরাং জাগ্রত চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায় না। বিজ্ঞান শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছাত্রেরা দলে দলে সহরে যাইয়া ইলেক্‌ট্রিসিটি, জলের কল, গ্লাস ফ্যাক্টরী, বরফের কল,

পাটের অফিসের হাইড্রলিক প্রেস, রেলওয়ে ষ্টেসন ইত্যাদি দেখিতে পারে। বিজ্ঞান শিক্ষক উহাদের কল কব্জার সাধারণ জ্ঞান দিতে পারেন।

উপযুক্ত শিক্ষকের চালনায় বাবুরহাটের একদল ছাত্র আগড়তলা, কালীকচ্ছ, চুণ্টা, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম যাইতে পারে; অথবা ঢাকেশ্বরী কটন মিলে এবং চরসিঙ্গুরে চিত্তরঞ্জন চিনির কলে। স্কুলের অন্ততঃ পাঁচটি গুণী ছাত্রের ব্যয়ভার স্কুল কমিটি বহন করিবেন, এই রূপ ব্যবস্থা থাকিতে পারে।

চট্টগ্রাম একমাত্র স্থান বঙ্গদেশে যেখানে পর্বত ও সমুদ্র দুইটাই দেখা যায়। চট্টগ্রাম যাইয়া ফেয়ারি হিলের (Fairy Hill) উপর হইতে চারিদিকের দৃশ্য, রেলওয়ে বিল্ডিং এবং সমুদ্র দেখা দরকার। রেলরাস্তার সৌন্দর্যও পর্যাপ্ত। আমাদের বিভাগের কবি নবীন চন্দ্র সেন মহাশয় বলিতেন—"ফেণী হইতে চট্টগ্রাম রেল-রাস্তাই আমার শেষ কাব্য।' তাঁহারই ইঙ্গিতে রেল রাস্তা প্রস্তুত হয়। সীতাকুণ্ড পাহাড় ঘেঁসিয়া গিয়াছে—রেল রাস্তা। ধূমাকীর্ণ পাহাড়ে অগণিত পাখীর কলরব। ডাইনে শস্যের ক্ষেত ও গোচারণের মাঠ। দূরে দূরে পাহাড়ের উপর বাড়ি—এইস্থানকে সত্যই মনোরম করিয়াছে।

পায়ে হাঁটিয়া এবং সাইকেলে দেশ ভ্রমণ এখনকার রেওয়াজ। শিক্ষক মহাশয়েরা সে দিকে ছেলেদের উৎসাহ দিতে পারেন। মানসিক শিক্ষা এবং বুদ্ধিচর্চা দ্বারা লোকের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। সেবা, সাহসের কাজ এবং দেশবাসীর প্রতি সহানুভূতি

দ্বারা লোকের চরিত্র গড়িয়া উঠে। তাহা না হইলে রোগীর সেবায় যুবকেরা হয় প্রাণহীন, বিপদে হয় বিহ্বল এবং উৎসবে হয় উচ্ছৃঙ্খল।

● * * *

শিক্ষা ব্যাহত হইতেছে—শিশু শিক্ষায়। শিশুশিক্ষা যাঁহাদের হাতে তাঁহারা অনেকেই অনুপযুক্ত। "বর্ণ-ক্রমিক" শিক্ষা দ্বারা তাঁহারা আরম্ভ করেন—অ, আ, ক, খ, গ, ইত্যাদি! এই বর্ণগুলি আয়ত্ত করিতে—ফলা, বানান দুরস্ত করিতে, অনেক সময় লাগে এবং বিশেষ নিরস বলিয়া শিশুর লেখা-পড়া শিক্ষার প্রতি বিরাগ ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়। শিশু-শিক্ষা হইবে "বাক্য-ক্রমিক।" এই বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু মহাশয়ের "ছোটদের পড়া" অতি উৎকৃষ্ট বই। কি করিয়া বাক্য-ক্রমিক বই পড়াইতে হয় তাহা বিশদরূপে ঐ বইতে আছে। সমস্ত বর্ণমালা প্রথমেই শিখাইবার দরকার হয় না। পড়িতে পড়িতে যে বর্ণ পাইবে তখনই শিখিবে। শিশুকে আমোদের মধ্য দিয়া শিক্ষা দিতে হয়। কিন্তু অনেক শিক্ষক পড়াইতে গিয়া বেতহাতে রুদ্রমূর্তি দেখান। আনন্দ কি, আমোদ কি, তাহা উঁহারা বুঝিতে পারেন না। তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হয়, অঙ্কে এক শতের মধ্যেই যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ, শিখাইতে হয়। স্কুলের একজন বি, টি শিক্ষক সর্বদা শিশু-শিক্ষকদের উপদেশ দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিলে ভাল হয়।

শিক্ষক হইবেন ক্রোধশূন্য, হাসি হাসি মুখ এবং মমতার প্রতিমূর্ত্তি। তিনি কথাবার্তা কহিবেন ছেলেদের সঙ্গে স্নেহের ভাষায়। কবিগুরুর শিশুদের জন্য লিখিত "সহজ পাঠ" প্রথম ভাগে নিম্নলিখিত একটি কবিতা আছে ঃ—

আলো হয়,
গেল ভয়,
চারি দিক
ঝিকি মিক্।

ছেলেদের মনে যেন এই কথা উদয় হয়—আমাদের প্রিয় শিক্ষক মহাশয় আসিতেছেন। তাঁহার আগমনে সূর্যোদয়ে সকাল বেলাকার মতো সমস্ত শ্রেণী আলোকিত হইবে তাঁহার হাসি মুখের দ্বারা। আমাদের মনের সমস্ত অন্ধকার দূর হইবে তাঁহার মমতাপূর্ণ ব্যবহারে এবং কথাবার্তায়।

দুঃখের বিষয়, গড়পরতা হাইস্কুলগুলির কার্যকারিতাশক্তি (efficiency) শোচনীয় ভাবে কমিয়া গিয়াছে। ছেলেরা ম্যাট্রিকুলেশন শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়া দুই ছত্র ইংরাজি লিখিতে পারে না। সুতরাং অনুপযুক্ত ছেলেদেরই পরীক্ষায় পাঠান হয়। ম্যাট্রিকুলেশনে যে প্রশ্ন আসে তাহার উত্তর নিজের ক্ষমতায় দিতে পারিবনা বলিয়া ছেলেদের মনে নিজের গুণের হীনতার (inferiority) ভাব আসে এবং ইহা হইতেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় নকলের হিড়িক দেখা যায়।

স্কুলের পরীক্ষাতেই নকলের হাতে-খড়ি হয়। ধরা পড়িলে

শাস্তি হয় নাম মাত্র। হয়ত পরীক্ষার হল্‌ হইতে বহিষ্কার বা কয়েক ঘা বেত। আমার মতে, নকল ধরা পড়িলে অন্যান্য শাস্তি হইবেই, তদুপরি স্কুল পরিত্যাগ করিতে হইবে, এই নির্দেশ থাকিলে ভাল হয়। নকল করিলে এই স্কুলে ছেলের স্থান হইবে না—স্কুল ত্যাগ করিতে হইবে, ম্যানেজিং কমিটীর এই অনুমোদন থাকিলে মন্দ হয় না। বুঝা যাইবে যে, নকলের কদভ্যাসের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আছে এবং তৎসঙ্গে অভিভাবকের দৃষ্টিও আকর্ষণ করা হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় গার্ডের উপর হস্তক্ষেপ প্রত্যেক বৎসরই হয়; গতবার এক গার্ডের মৃত্যু ঘটায় নকলের বিষময় ফল চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্বজ্জন সভা। এই পাপের উচ্ছেদ নিজেরাই করিবেন। কিন্তু আমরা দেশবাসিগণ কি অধঃপাতে যাইতেছি, তাহা আমাদের সকলের চিন্তা করিয়া দেখা দরকার।

স্কুলের কার্যকারিতাশক্তি উন্নত না হইলে ইহার প্রতিকার আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। তহবিল বৃদ্ধির জন্য অনুপযুক্ত ছেলেকে প্রমোশন দেওয়া এবং ইচ্ছা করিয়া স্কুলের কার্যকারিতা শক্তি (efficiency) খর্ব করাই ইহার মূলে।

স্কুলে নীচের শ্রেণী হইতে তৃতীয় শ্রেণীর (Class VIII) পর্যন্ত এক খানা সরল ইংরেজি সাহিত্য পড়াইতে হয়। ঐ বইতেই গদ্য পদ্য নিবন্ধ আছে। কিন্তু ছেলেরা দ্বিতীয় (Class IX) শ্রেণীতে প্রমোশন পাইলে এমন কঠিন ইংরেজিতে লেখা

বই তাহাদের পড়িতে হয়, যে তাহাতে সম্যক জ্ঞান লাভ অনেক ছাত্রের পক্ষেই অসম্ভব। বইএর সংখ্যা অনেক—পাঁচ খানা। অনেক ছাত্র জলে পড়িয়াছে বলিয়া মনে করে। ফলে, না বুঝিয়া অর্থ বই মুখস্থ করিতে হয়, পরীক্ষা পাশের জন্য। বলিতে গেলে, ইংরেজির দিক হইতে তৃতীয় শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণী অনেকটা উঁচু—মধ্যে স্বাভাবিক সিঁড়ি নাই। ইহা ব্যায়ামের উচ্চ লাফের মতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বহু ছাত্রের অকৃতকার্যতার এবং নকলের কারণ এই খানে। হাই স্কুলে কত ছাত্রের কি বিষম ক্ষতি হইতেছে, ভাবিয়া দেখিলে অবাক হইতে হয়। শতকরা ৪৫ জন পাশ। জাতির পক্ষে অবশিষ্ট শতকরা ৫৫ জনের অপচয়, দুঃসহ ক্ষতি। ইহার আশু প্রতিকার বাঞ্ছনীয়।

ভাষা আয়ত্ত হয় প্রধানত অনুবাদের দ্বারা। অনুবাদের মধ্য দিয়া ভাষার খুঁটিনাটি সব ধরা পড়ে এবং ভাষার জ্ঞান ভাল হয়। ইংরেজি হইতে বাংলা এবং বাংলা হইতে ইংরেজি অনুবাদ আজ কাল খুব কম হয় হাই স্কুলগুলিতে। বিশ্ববিদ্যালয় অনুবাদে রাখিয়াছেন কুড়ি নম্বর। ম্যাট্রিকুলেশন আরম্ভ হইতে—১৯১০ সন হইতে ১৯৩৯ পর্যন্ত—অনুবাদে ছিল সত্তর। দুইটি প্যারা ইংরেজিতে অনুবাদ করিতে হইত, প্রত্যেকটিতে পঁয়ত্রিশ নম্বর। ছাত্রেরা ইংরেজিতে কাঁচা হইবার কারণ, অনুবাদ কম করে। অনুবাদের নম্বর বাড়াইয়া অন্তত পঞ্চাশ করিলে ছেলেদের ইংরেজি জ্ঞান ভাল হইবে, আমার বিশ্বাস।

যখন স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বময় কর্তা ছিলেন,

তখন সব বিষয়ের আদর্শ প্রশ্ন এবং পরীক্ষায় পরীক্ষক মহাশয়েরা উত্তরের কাগজে কি কি ত্রুটি দেখিলেন, তাহা সারকুলাররূপে প্রত্যেক স্কুলে প্রেরণ করিতেন। এখন পুনরায় ঐ আদর্শের অনুসরণ করিলে দেশের বহু উপকার হইবে।

বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক উর্বর বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। পরীক্ষা যত কঠিনই হৌক না সে ইহার ভিতর দিয়া উত্তীর্ণ হইবেই। কিন্তু মস্তিষ্কের উপর ভার সহিবে কি না, মস্তিষ্ক ক্ষয়ের জন্য পরীক্ষার্থীর খাদ্য, স্বাস্থ্য, প্রভৃতির যোগাড় আছে কি না, দেখা দরকার। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে ছেলেরা ক্ষীণ স্বাস্থ্য লইয়া অগ্রসর হইতে পারে না। দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধ অনেক দুঃখ আনয়ন করিয়াছে আমাদের জন্য।

পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের বহু পূর্বে, খাদ্যশস্য ও অন্যান্য খাদ্যের প্রাচুর্যের (?) দিনের আমার নোট বহির এক পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

মোট ছাত্র সংখ্যা—৪২৬।

এক বেলা দুধ খাইতে পায়, এমন ছাত্রের সংখ্যা—১২৩।

দুই তিন দিন অন্তর মাছ খাইতে পায়, এমন ছাত্রের সংখ্যা—২৮২।

সপ্তাহে দুইটি ডিম বা তাহার অংশ খায়, তাহার সংখ্যা—২৭।

পনের দিন অন্তর মাংস খাইতে পায়, তাহাদের সংখ্যা—৮।

বিকালে স্কুল হইতে যাইয়া মুড়ি মুড়কি অথবা ভাত খাইতে পায়, তাহাদের সংখ্যা—২৫৬।

এই হইল প্রাচীন কাহিনী। কিন্তু বর্ত্তমানে তিন টাকা সেরের মাছ অনেক ছাত্রের ভাগ্যে জুটে না। আট আনা সেরের *দুধ এবং দশ পয়সা মূল্যে একটা ডিম জুটিবার কথা নয়।*

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার স্বনামধন্য পিতার মতই ছাত্রদের শুভাকাঙ্ক্ষী। তাঁহার দেশ প্রত্যাশা করিতেছে, তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া সমস্ত হাই স্কুলের ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা যাহাতে সরকারী ব্যয়ে হইতে পারে, সেই ব্যবস্থা করিবেন। ডাক্তারের রিপোর্ট বাহির হইলে দেশ অবাক হইবে—অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া ছাত্রদের স্বাস্থ্য কত শোচনীয় ভাবে মন্দের দিকে চলিয়াছে।

১৯৪৫ সনের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায়— বিশেষত ম্যাট্রি-কুলেশন পরীক্ষার ফল বহু স্কুলের পক্ষে বড়ই শোচনীয় হইয়াছে। নূতন সিলেবাসে (পাঠক্রমে) পাঁচ বৎসর পরীক্ষা হইতেছে। এই নিয়মে পরীক্ষা পাশ অধিকাংশ ছেলের ক্ষমতায় কুলায় না। সুতরাং হতাশার উদ্ভব হয় এবং এই জন্য পরীক্ষায় নকলের হিড়িক, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয় ইহার প্রতিকারকল্পে পাঠক্রম সংশোধনের জন্য বৈঠক বসাইয়াছেন! ইহা সুখের বিষয়।

আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, মৌখিক অনুবাদ (oral translation) ছাত্রদের পক্ষে পরম উপকারী। উহাতে ছাত্রদের মনে সাহস আসে এবং ব্যাকরণের ভুল কমিয়া যায়। কেবল উপরের শ্রেণীতে নহে, নীচের শ্রেণীতেও

ঐ উপায়ে ইংরেজি ভাষার প্রাত ভয় ও বিতৃষ্ণা ক্রমশ লোপ পায়। আমার বিশ্বাস এই উপায়ে ইংরেজি শিক্ষার দ্রুত উন্নতি হইবে। সংস্কৃত ও আরবী ভাষায়ও ঐ প্রক্রিয়া সমান ভাবে কার্যকরী হয়—এইটি আমি ইচ্ছা করি। হেড্‌মাষ্টার মহাশয়েরা ইচ্ছা করিলে শ্রেণীর শিক্ষককে সামনে রাখিয়া পদ্ধতিটি (Demonstration) দেখাইতে পারেন।

বাংলা ভাষার জ্ঞানের উপরই ইংরেজি ভাষাবোধ নির্ভর করে। বাংলা বই ছেলেরা পড়ে কম। বাংলা লিখিবার অভ্যাস মাত্রও নাই। চিঠি পত্র লিখিয়া এবং ডায়েরি লিখিবার অভ্যাস থাকিলে বাংলা লিখিবার আশ্চর্য উন্নতি হয়। ইংরেজি ছয় হাজার মাইল দূরের ভাষা। কিছু কম জানিলে লজ্জা নাই। কিন্তু বাঙ্গালী ছেলের বাংলা ভাষায় জ্ঞান নাই—দুই ছত্র লিখিতে পারে না, ইহা শুনিলে হাসি পায়। চাই প্রেরণা। প্রকৃষ্ট লাইব্রেরী আছে অনেক স্কুলে। শিক্ষকগণ যদি লাইব্রেরীর যথাযোগ্য ব্যবহার করেন, তবে ছাত্রেরা প্রেরণা পাইবে যথেষ্ট। শিক্ষকেরা অলস নির্জীব এবং প্রাচীনপন্থী হইলে প্রখর আলোক-দীপ্ত আধুনিক জীবন প্রণালীর কি প্রেরণা দিবেন ?

শিক্ষক হইলেন শিক্ষার প্রতীক। নবজীবনের দীপ্তি চাই তাহাদের চোখে মুখে। ঘুমে থাকিলেই ত কলিকাল, জাগিলেই দ্বাপর, দাঁড়াইলেই ত্রেতা এবং চলিতে আরম্ভ করিলেই সত্য যুগ। অতএব চলিতে হইবে অগ্রসর হইয়া। পরিবর্তনের বন্যা আসিতেছে। সমস্ত দেশ শিক্ষায়, শিল্পে এবং সর্ববিধ

কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিপূর্ণ হইয়া বৃহত্তর বঙ্গদেশের জন্ম দিবে। সে দিন আগতপ্রায়।

● * * *

ভাল সেই স্কুল, যাহাতে শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষক আছেন, যাঁহারা উন্নত প্রণালীতে শিক্ষা দিতে অভ্যস্ত। আর চাই বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্র—যাঁহাদের মধ্যে প্রশ্নহীন নির্ভরতা নাই কিন্তু জাগ্রত চিত্তের পরিচয় আছে। চাই সুবিবেচক অভিভাবক শ্রেণী—যাঁহারা অদৃষ্টবাদী নহেন, কিন্তু বাস্তবিক কর্মী এবং ছেলেদের যথার্থ মঙ্গলকামী।

লোকসমাজে শরীর রক্ষার জন্য খাদ্য ও বস্ত্রের রেশন হইয়াছে। শিক্ষাও খাদ্য আর বস্ত্রের ন্যায় দরকার সমাজের। মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা আমাদের সমাজে হয় না। সমস্ত দেশকে একই মাপে, একই প্রমাণের ষোলো গিরা সার্ট করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এমন হইয়াছে যে, এই শিক্ষাপ্রণালী যে সমাজ দেহের পুষ্টিকর লোকে তাহা মনে করিতে পারে না। এই শিক্ষাপ্রণালী বর্তমান সমাজ হজম করিতে পারে না—তাই অগ্নিমান্দ্য হইয়াছে। সমাজের যাহা প্রয়োজন তাহার পরিপূরণ এই শিক্ষা প্রণালীর দ্বারা হইতেছে না। এখন দেশ চায় জাতীয় শিক্ষা। কেবল উচ্চ শ্রেণীর—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের শিক্ষা নহে, আপামর সব জাতের শিক্ষা—যাহা ব্যবহারিক জীবনোপায়ের সহায় হইবে। কেরাণী তৈরি করিবার উদ্দেশ্য নিয়া যে শিক্ষা প্রণালীর উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা এখনই স্থগিত হউক।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার মতো মাতৃ ভাষাতেই আই, এ, আই, এস্‌সি, বি, এ; বি, এস্‌সি, পরীক্ষা হউক, এই প্রার্থনা করিতেছে দেশ।

প্রত্যেক দশ বৎসর অন্তর সমাজের গতি ও আবশ্যকতা দেখিয়া দেশের শিক্ষা প্রণালীর পরিবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন—যেমন করিয়া সব প্রগতিশীল দেশে হয়। ভারত গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিষয়ে পরামর্শদাতা ডক্টর সার্জেণ্ট মহোদয় বিপুল অর্থ-ব্যয়ে শিক্ষা-সংস্কার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার মতে জাতির সকল স্তরের শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে। বাংলা দেশের শিক্ষার জন্য সাতান্ন কোটি টাকা দরকার। ইংলণ্ডে আজকাল শিক্ষার জন্য মাথাপিছু ব্যয় পঞ্চাশ শিলিং--প্রায় পঁয়ত্রিশ টাকা। আমাদের দেশেও মাথাপিছু প্রায় দশ টাকা লাগিবে। এত টাকা আমাদের দেশে কোথা হইতে আসিবে? উত্তর ডাঃ সার্জেণ্ট নিজেই দিয়াছেন। "যুদ্ধের ব্যাপারে দেখা গিয়াছে, প্রয়োজন মনে করিলে অর্থের অভাব হয় না।" যদি আমরা সত্যই শিক্ষার দরকার এই কথা বুঝি, তবে অর্থের অভাব হইবে না।

বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে ১৪৭৬টি হাই স্কুল আছে। দেশে শিক্ষা-ব্রতী যাঁহারা আছেন, এখন অবধিই চিন্তা করিতে থাকুন কোন্ কোন্ বিষয়ে পরিবর্ত্তন চাহেন। হাই স্কুলগুলিকে বাদ দিয়া কোন শিক্ষা প্রণালীর পরিবর্ত্তন দেশে সম্ভব নহে। নিখিল-বঙ্গ-শিক্ষক-সভা নিশ্চয়ই অবহিত আছেন।

ডক্টর সার্জেণ্টের কল্পিত শিক্ষা প্রণালীর উদ্দেশ্য কেরাণী তৈরি করা জন্য নহে; বাস্তবিক তাহা জাতির সর্বসাধারণের মধ্যে যান্ত্রিক শিক্ষা প্রচলন করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত। পূর্ণমাত্রায় যান্ত্রিক শিক্ষা পাইলে লোকে ফ্যাক্টরি গঠন করিয়া শিল্প সম্ভার বৃদ্ধি করিতে পারিবে এবং এই রূপে দেশের দুর্দশার কিছুটা লাঘব হইবে। আমাদের সমাজে শ্রেণী বিন্যাসের অবধি নাই। আরও দুঃখের বিষয়, অভিজাত মনোভাব আমাদের মধ্যে প্রবল। তাহার দ্বারা আমরা সকলকে দাবাইয়া রাখিতে চাই। বাস্তবিক সমাজনীতি ও শিক্ষানীতি সমান ক্ষেত্রে না চলিলে কোন দেশের মঙ্গল নাই। একমাত্র রাশিয়ায় সমাজ-দর্শন ও শিক্ষা-দর্শন পাশা-পাশি কাজ করিতেছে। আর কোনও দেশে সমাজ-দর্শন ঐরূপ উন্নত হয় নাই। আমেরিকার সমাজে শ্রেণী বিন্যাস অনেক কম। আমেরিকা সেই জন্য শিক্ষা বিষয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। তৃতীয় স্থানে আছে ইংলণ্ড। আমাদের স্থান জগতে কোথায়, শিক্ষাব্রতীরা দেখিবেন।

আমাদের দেশে শিক্ষাসংস্কার বিষয়ে রাশিয়ার শিক্ষাপ্রণালীই অনুসরণ করা কর্তব্য। রাশিয়ায় সতর বৎসর পর্যন্ত আবশ্যিক শিক্ষা—বিনা বেতনে। ইংলণ্ডেও আবশ্যিক শিক্ষা চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত। তাহা এইবার ষোল বৎসর পর্যন্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

রাশিয়ায় জারের আমলে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোকের সংখ্যা ছিল শতকরা ২১·২ জন। সেই সংখ্যা শতকরা একশত জনে দাঁড়াইয়াছে—১৯৪৪ সনে!

হিট্‌লার পঞ্চম বাহিনীর সাহায্য পাইয়াছিলেন হল্যাণ্ড নরওয়ে ও ফ্রান্সে। ঐ সব দেশে দেশদ্রোহীর অভাব ছিল না। কিন্তু রাশিয়ায় পঞ্চম বাহিনী একেবারেই ছিল না। সুতরাং হিট্‌লার তাহা পান নাই। কোন দল নিজের স্বার্থের জন্য দেশের স্বাধীনতা বলি দেয় নাই। সে দেশের শিক্ষাপ্রণালী কত বলশালী ইহাতেই বুঝা যায়।

পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে অসৎ, অর্থলোভী ব্যবসায়ীর দ্বারা আমাদের দেশের কত অনিষ্ট হইয়াছে। দেশের লক্ষ লক্ষ লোক অন্নাভাবে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা নির্মমভাবে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে। দেশের স্বাধীনতার কোন মূল্য আছে কি তাহাদিগের নিকট? এই দুর্নীতির সংশোধন করিতে হইলে খুব বলশালী সংস্কার দরকার শিক্ষাপ্রণালীর।

আমাদের দেশে অবৈতনিক শিক্ষা প্রহসনে পরিবর্তিত হইয়াছে। দেশে শিক্ষাকর বসিয়াছে। কিন্তু শিক্ষা সেই অনুপাতে হইতেছে না। স্কুল গৃহগুলি খেলো ভাবে নির্মিত হইয়াছে। শিক্ষক নিয়োগ একটি ছেলে খেলা—কোন প্রকারে দেশের অবোধ লোককে বুঝানো। বি, টি, অভাবে একজন বি, এ, শিক্ষকের হাতে অন্ততঃ তিনটি অবৈতনিক পাঠশালার কর্তৃত্ব থাকিলেও কিছু হইত। দুই দিন করিয়া এক-এক স্কুলে পড়াইতে পারিতেন।

দেশে ট্রেইণ্ড্ শিক্ষক—বি, টির খুব অভাব। বিশ্ববিদ্যালয় ঐ অভাব হেতু হাই স্কুলগুলির বিজ্ঞান শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে

পারিতেছেন না। দেখিতে দেখিতে পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গেল। বিজ্ঞান শিক্ষা অনেক স্কুলে মাত্রও হয় না। বঙ্গদেশের প্রথম শ্রেণীর কলেজগুলিকে বি, টি, পড়ানোর অধিকার না দিলে কবে ট্রেইণ্ড্ শিক্ষকের অভাব পূরণ হইবে ঈশ্বর জানেন।

সঙ্কীর্ণ কলসের মধ্যে মাছ জিয়ান থাকিলে যেমন কদাকার হয়, গ্রামের স্কুলে, অনুন্নত সমাজে, ছেলেদের শরীর ও মন তেমনি কদাকার হইবার সম্ভাবনা আছে। ক্ষুদ্র বিষয়ের চিন্তাতে, ক্ষুদ্র আদর্শের মধ্যে মানব আত্মাও ক্ষুদ্রাশয় হইয়া যায়। তখন তাহার চিন্তা ক্ষুদ্র, আলাপ ক্ষুদ্র, আমোদ ক্ষুদ্র, আকাঙ্ক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। ইহার প্রতিকার হইতে পারে, যদি স্কুলের একজন বা দুই জন শিক্ষক—যাঁহারা বাহিরের জগতের সংবাদ রাখেন—ছাত্রদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মিশিয়া তাহাদের মনের চিন্তা, আমোদ ও ব্যায়াম সুচিন্তিত প্রণালীতে নিয়মিত করিতে পারেন। তাঁহাদের সঙ্গীত ও অভিনয় জানা থাকিলে ভাল হয়। পল্লী ভ্রমণ, বন ভোজন, ব্যঙ্গ কৌতুক, সঙ্গীত, আবৃত্তি ইত্যাদি কর্ম্মসূচী থাকিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার কথা।

ছত্রিশ বৎসর পূর্বে স্কুলের ছাত্রদের চরিত্র গঠনের জন্য আমাদের মধ্যে "আশাবাহিনী" নামক এক সভার সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহার নিয়মাবলীর মধ্যে মাসে এক বেলা কেবলমাত্র লবণ দিয়া ভাত খাইবে, এক বেলা উপবাস করিবে এবং মাসে এক দিন মৌনী থাকিবে, এই নিয়ম ছিল। আজকাল বাঙ্গালীর ছেলের সংস্কৃতি ও সংযম নাই বলিয়া শুনিতেছি। বাঙ্গালীরা

ব্যবহার জানেনা বলিয়া একটা দুর্নামও আছে। এই জন্য চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে "আশাবাহিনী"র যে নিয়ম ছিল তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলে ছাত্রদের মঙ্গল হইবে মনে করি :—

(১) মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া কোনও সভ্য সমাজে যাওয়া উচিত নহে।

(২) দীর্ঘ নখ ও কেশ এবং অপরিস্কৃত দন্ত অভদ্রতা জ্ঞাপক ; পরন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষেও বিশেষ অনিষ্টকর।

(৩) আলুলায়িত কেশে এবং বস্ত্রাদি সুসংযত না করিয়া (যেমন, পরিধেয় বস্ত্রের কিয়দংশ কোমরে জড়াইয়া) ভদ্র সমাজে উপস্থিত হইতে নাই।

(৪) ভদ্র সমাজে যাইয়া বিশেষ বিবেচনাপূর্বক, আসন গ্রহণ করিতে হয়। "বসিতে জানিলে উঠিতে হয় না" এই প্রবাদবাক্য এতৎ সম্পর্কে সর্বদা স্মরণীয়।

(৫) অন্যের প্রারম্ভিত কোনও আলোচনায় বা ক্রিয়ায় অযাচিতভাবে যোগদান করা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ।

(৬) অন্যের অক্ষমতা এবং অঙ্গহীন ও উন্মাদ লোকদিগের দর্শনে হাস্য করা হৃদয়হীনতার পরিচায়ক।

(৭) মুখ আবৃত না করিয়া ভদ্র সমাজে হাই তোলা, হাঁচি ও কাসি দেওয়া অন্যায়।

(৮) লোক সমাজে অট্টহাস্য করা, অনাবশ্যক উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা এবং কেবল নিজের বক্তব্য সকলকে শুনাইতে ব্যস্ত হওয়া, অসভ্যতা জ্ঞাপক।

(৯) ভদ্র সমাজে আসন, পুস্তক অথবা অন্য কিছু অবলম্বনে বাজনার বোল বাজানো ভদ্রতা বিরুদ্ধ।

(১০) নিজ কার্য্য, ব্যবসায় এবং সুখ দুঃখ সম্বন্ধে সর্বসমক্ষে আলোচনা করা অন্যায়।

(১১) যেখানে বহু লোকের আহার ও শয়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে, সেখানে বিশেষ কারণ ব্যতীত এবং উপস্থিত অন্যান্যের অনুমতি না লইয়া, সর্বাগ্রে নিজের ব্যবস্থা করিয়া লওয়া অতীব গর্হিত। নৌকায়, রেলে ও ষ্টীমারে নিজের অসুবিধা হইলেও সাধ্যমত অন্যের সুবিধা করিয়া দেওয়া উচিত।

(১২) যে কোন সমাজে অন্যের প্রারব্ধ বক্তব্য শেষ না হইতে নিজের মন্তব্য প্রকাশ করা ভদ্রতা বিরুদ্ধ।

(১৩) কেহ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর না দিয়া মৌনাবলম্বন করা অথবা কাহারও কোন চিঠির উত্তর না দেওয়া, ঘোরতর অভদ্রতা।

(১৪) কোনও মান্য ব্যক্তির আগমনে সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করা কর্তব্য। তাঁহার প্রস্থানের সময়েও কিয়দ্দূরে, অন্ততঃ গৃহের দ্বার পর্যন্ত, তাঁহার অনুগমন করা উচিত।

(১৫) মান্য ব্যক্তির সমক্ষে অসুস্থ বা ক্লান্তি বোধ না করিলে মাত্র অলসতা বশতঃ, শয়ন করা অনুচিত।

(১৬) সর্ববিষয়ে সর্বাগ্রে স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন ও ভারাক্রান্ত ব্যক্তিদের সুবিধা করিয়া দেওয়া প্রকৃষ্ট শিষ্টাচার।

(১৭) প্রাচীন ব্যক্তিদিগের সমক্ষে কথাবার্তায় বাচালতা বা আকার ইঙ্গিতে চঞ্চলতা প্রকাশ সর্বথা বর্জনীয়।

(১৮) অপরের সম্বন্ধে কোনও গ্লানির কথা শুনিলে হঠাৎ তাহাতে বিশ্বাস করা সারহীনতার পরিচায়ক।

(১৯) গুণীলোকের নিন্দা করা অন্যায়; চাটুবাদও দূষ্য। নিন্দা বা প্রশংসার স্থলে তিলকে তাল করা সঙ্গত নহে।

(২০) লোকে যে কারণেই বিপন্ন হউক, বিপদের সময় কাহাকেও বিদ্রূপ করা—এমন কি শত্রুর বিপদেও সুখবোধ করা, নৃশংস প্রকৃতির পরিচায়ক।

(২১) যেখানে অনেকে মিলিয়া কথোপকথন বা তর্কবিতর্ক করিতেছেন, সেখানে যিনি যাহা বলেন শ্রবণ করাই বিধেয়। তখন পার্শ্বস্থ লোকের সহিত বাক্যালাপ করিয়া শ্রোতাদিগের বিরক্তি জন্মান ঘোরতর অশিষ্টতা।

* ● ● ●

আমাদের পুঁথির কথা একরূপ আর সমাজগত ব্যবহার অন্যরূপ। বুদ্ধি দিয়া আমরা যাহা শিখি, সামাজিক ব্যবহারে তাহার বিপরীত করি। আমার এক বন্ধু এম্, এ, বি, এল্ উকিল। তাঁহার ভগ্নী বিবাহের ছয় মাস পরেই বিধবা হন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি ভগ্নীর আবার বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন না কেন? আজকাল বিধবা বিবাহ সর্বত্রই হইতেছে।" তিনি বলিলেন—"তাহা কি রূপে হইবে? বিবাহ একবারই হয়। বিধবা বিবাহ, বিবাহই

নয় এবং হইতে পারে না।” আমি বলিলাম—“বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “বিধবা বিবাহ বিচার” কি আপনি পড়েন নাই ? স্যার আশুতোষ বিধবা মেয়ের বিবাহ দিলেন আর রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ বিধবা বিবাহ করিয়াছেন। আপনি শিক্ষিত, এই দুই দেশপ্রসিদ্ধ লোক যদি আপনার আদর্শ না হয়, তবে আপনি কাহাকে আদর্শ মানেন ? আপনার ভগ্নী লেখাপড়া বেশি কিছু জানেন না। সমস্ত জীবন কি করিয়া কাটাইবেন, আমি বুঝিতে পারি না। আপনার ভাই বিপত্নীক হইবার তিন মাস মধ্যে আবার বিবাহ করিলেন। পুরুষের পক্ষে দুই বা একশতবার বিবাহ হইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকের মাত্র একবার ? এই পক্ষপাত দৃষ্টি আপনার শিক্ষিত মন এড়াইয়া যায়, এইটে দুঃখের বিষয়।”

আমরা স্কুল পাঠ্য বইতে অনেক প্রসিদ্ধ লোকের জীবনী পড়ি। কিন্তু তাঁহাদের চরিত্র, বিশেষ বিশেষ গুণ, আমাদের মনের উপর ক্রিয়া করে না—আমরা মাত্রও প্রভাবিত হইনা। উপরের শ্রেণীর কোন ছাত্রকে যদি জিজ্ঞাসা করি—তুমি কোন্ জীবিত বা মৃত প্রসিদ্ধ লোককে আদর্শ বলিয়া মনে কর,—তোমার জীবনের আদর্শ কি ? উত্তরে সে কিছুই বলে না। আমরা কেবল পড়ি—বুদ্ধিপূর্বক নহে ; পাশ করি—মুখস্থ বিদ্যার দ্বারা ; এবং কাজে লিপ্ত হই—নিজের ইচ্ছায় নহে, দৈবের উপর নির্ভর করিয়া।

   

প্রগতিশীল দেশে স্কুলের ধনাগার সর্বদাই পূর্ণ থাকে। গভর্ণমেণ্টের দান, কাউন্টি কাউন্সিলের দান, ট্রেড্ ইউনিয়নের দান—অজস্র পায় স্থানীয় স্কুল। আমাদের দেশে অনেক আবেদনের ফলে গভর্ণমেণ্টের দান আসে মাসিক এক শত হইতে তিন শত টাকা। স্থতরাং স্কুল রাখিতে হয় ছাত্র-সম্পদের উপর নির্ভর করিয়া। একটি ছাত্র ট্রান্সফার চাহিলে—অন্য স্কুলে যাইতে চাহিলে, স্কুল বিপদ গণে, ফলে প্রমোশন হয় জলের মতো! অনুপযুক্ত ছাত্র দ্বারা ক্লাশ ভর্ত্তি। গবর্ণমেণ্ট চাহেন কণ্ট্রোল বা কর্ত্তৃত্ব। পর্যাপ্ত সাহায্য ছাড়া এই কর্ত্তৃত্বের মূল্য নাই। আশ্চর্যের বিষয়, পুলিশ বিভাগে যত খরচ হয় শিক্ষা বিভাগে তাহা হয় না। ইংলণ্ডে ছয় কোটি লোকের জন্য বার্ষিক শিক্ষাব্যয় সত্তর কোটি টাকা। আর বঙ্গদেশে সম সংখ্যক লোকের জন্য তুই কোটি টাকাই যথেষ্ট!

আমাদের দেশে প্রতি স্কুলে শিক্ষকবর্গের বেতন বাবতে যত টাকা ব্যয় হয় তাহাই গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দেওয়া উচিত। তাহা না হইলে স্কুলের দৈন্য-দশা দূর হইবার আর আশা নাই। আজ কাল যে টাকা মাসিক সাহায্য বাবত দেওয়া হয়, তাহা প্রধান শিক্ষকের বেতন হইতেও কম। হয়ত ডাঃ সার্জেণ্ট মহোদয়ের পরিকল্পনা অনুসারে স্কুলের আয় অনেক বাড়িয়া যাইবে। সে আশায় আশান্বিত থাকাই আমাদের স্থখ।

শিক্ষক মহাশয়দিগের নিকট আমার নিবেদন, বাঙ্গালীর গুণ ও ক্রটির বিষয় যেন বিশেষ করিয়া উচ্চতর শ্রেণীতে আলোচনা

করেন। নতুবা যুদ্ধোত্তর কল্পনায় জাতি কি করিয়া বড় হইবে—পৃথিবীর সকল জাতির সহিত সমান ভাবে পা ফেলিয়া চলিবে? রাজা রামমোহন রায় হইতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ কত বাঙ্গালী সমগ্র ভারতের নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। রাজা রাম-মোহনের মৃত্যুর একশত বৎসরের মধ্যে বঙ্গভূমি কত শ্রেষ্ঠ সন্তানের জন্ম দিয়াছেন ভাবিলে আমরা বিস্মিত হই। সকলের নাম উল্লেখ করিবার প্রয়োজন দেখি না। রাজনীতি ক্ষেত্রে—সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, শিক্ষা ক্ষেত্রে—স্যার আশুতোষ, দর্শনে—ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আইন ব্যবসায়ে—রাসবিহারী ঘোষ, বিজ্ঞানে—জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, সাহিত্যে—বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্র নাথ, সাংবাদিক—শিশির কুমার ঘোষ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ সমগ্র ভারতের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অন্যান্য দেশের বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। এত বড় যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান তাহার প্রতিষ্ঠা হয়, বাঙ্গালীর দ্বারা। সকল প্রদেশে নানাবিধ জাতীয় আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন বাঙ্গালী। তাঁহারা একে একে পরলোকগত হইয়াছেন। এখন আমরা শক্তিহীন ও অসহায় হইয়া পড়িয়াছি। জাতি যদি প্রতিভাহীন হয় তবে তাহার সম্মান রাখিবে কে?

আমাদের শক্তিক্ষয়ের কারণ অনেক। সংযম (Discipline) এবং অন্যকে মানিয়া চলা (Obedience) আমাদের মধ্যে নাই। কোন আদর্শ, কোন নীতি, কোন বিধিনিষেধই পালন করিবার সংযমমূলক মনোবৃত্তি আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। উচ্ছৃঙ্খল

ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া ধ্বংসের মুখে চলিয়াছি। আমরা সকলেই নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করি। সমাজে বালক ও যুবকের নিকট বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধের মর্যাদা নাই। অন্যের সমালোচনা ও পাকা কথায় এবং নেতৃত্বে আমাদের তুল্য কেহ নাই! আদেশ করিতে, সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে, প্লান তৈরি করিতে আমরা সকলের সেরা—ইহাই আমাদের ধারণা।

উড়িষ্যাবাসিগণকে বাদ দিলে শারীরিক স্বাস্থ্যে আমরা অন্যান্য যাবতীয় প্রদেশের নরনারী অপেক্ষা নিকৃষ্ট। মস্তিষ্কের ক্ষমতায়ও আমরা পশ্চাৎপদ হইতেছি। আমরা অধিক পরিমাণে শ্রমবিমুখ এবং আরামপ্রিয় হইয়া পড়িতেছি। চাই উৎসাহ, অধ্যবসায়, অবিশ্রান্ত কর্মতৎপরতা ; নতুবা আলস্যপরায়ণ দীর্ঘসূত্রীর জীবন জাতির পক্ষে হীনতার পরিচায়ক হইবে।

ভাষা, খাদ্য ও পোষাক জাতির বিশেষত্ব প্রকাশ করে। বাঙ্গালীর আজ কিছু থাকুক না থাকুক তাহার ভাষা ও সাহিত্য লইয়া সে গৌরব করিতে পারে। লোক সংখ্যা হিসাবে বাংলা ভাষা জগতের সমগ্র ভাষার মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ভাবসম্পদে, গাম্ভীর্যে, সরসতায় বাংলা সাহিত্যকে হীন বলিয়া মনে করিবার অবকাশ নাই। কেবল মাত্র দুইটি জোতিষ্কের কথাই এখানে বলিব। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭২ সনে "বঙ্গদর্শনের" সূচনায় লিখিতেছেন :--"আমরা ইংরেজী বা ইংরেজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি, যতদূর ইংরেজী চলা আবশ্যক ততদূর চলুক, কিন্তু একেবারে ইংরেজ হইয়া বসিলে

চলিবে না। আমরা যত ইংরেজি পড়ি, যত ইংরেজী কহি, যত ইংরেজী লিখিনা কেন, ইংরেজী কেবল আমাদের মৃত সিংহের চর্ম স্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক দিবার সময় ধরা পড়িব।" এই প্রবন্ধ "বঙ্গদর্শনে" বাহির হইলে শিক্ষিত লোকেরা বাংলা সাহিত্যের চর্চা করিতে আরম্ভ করেন। তারপর, "বঙ্গদর্শনে" প্রবন্ধ ও মনোরম উপন্যাস লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সম্রাট উপাধি লাভ করেন। তারপর রবীন্দ্রনাথের যুগ। রবীন্দ্রনাথকে পাইয়া এই দেশ ধন্য হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিভা। তাঁহার দান, গানে, নাটকে, উপন্যাসে, কাব্যে, প্রবন্ধে ও শিশুসাহিত্য—যে দিকেই দেখি অবাক হইয়া যাই। তিনি শিল্পী, তিনি সঙ্গীতজ্ঞ, তিনি দেশ-প্রেমিক, তিনি সুশিক্ষক, তিনি সত্যদ্রষ্টা। তাঁহার জীবন সমুদ্রের মতই অগাধ। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে ও সাধনায় দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে হাজার বৎসরের গৌরব দান করিয়াছেন। রবীন্দ্র সাহিত্যের সংস্কৃতি ও রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুশীলনের মধ্য দিয়া নবীনেরা দেশকে গৌরবময় ভবিষ্যতের দিকে পরিচালিত করিতে পারেন। আমাদের আশা আছে, যদি কোন ভাষা ভাবসম্পদে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইতে যোগ্যতার দাবী রাখে তবে সে বাংলা ভাষা।

* ● ● ●

আমরা শর্করা জাতীয় খাদ্য বহুল পরিমাণে খাই। তাহাতে শরীর স্থূল হইয়া দাঁড়ায়। অমনিই তো বাঙ্গালী খর্বকায়,

তাহাতে আবার শরীর বিপুল হইলে চেহারা উজ্জ্বল ও স্মার্ট্ হইতে পারে না।

কাটাছাঁটা নানাবিধ পোষাক,—টুপি, ট্রাউজার ও কোট সর্ব প্রথমে চীনারাই ব্যবহার করে। প্রাচীন রোম ও গ্রীস দেশেও আমাদের মত ধুতি চাদরের ব্যবহার ছিল। গ্রীক বীর আলেক্-জাণ্ডার যখন পারস্য দেশ জয় করেন তখন ধুতি ছাড়িয়া ট্রাউজার পরিতে আরম্ভ করেন। কালে সমস্ত ইউরোপে ট্রাউজারই জাতীয় পোষাকরূপে ব্যবহৃত হয়।

বাঙ্গালীর নির্দিষ্ট পোষাক নাই। ইহা ভাল কি মন্দ নবীনেরা ভাবিয়া দেখুন। পোষাক আমাদের দুই জাতীয় হইলেই ভাল। ভদ্র সমাজে ও নিমন্ত্রণ উপলক্ষে চলার এবং কর্মীর বা খাটুনির পোষাক। প্রথমের পক্ষে—ধুতি পাঞ্জাবী ও চাদর। আর দ্বিতীয়—কর্মীর পক্ষে, সর্ট (হাফ্ প্যাণ্ট) ও হাত কাটা জামা।

আমার মতে স্কুলের ছাত্ররা কর্মীর পোষাক পরিলেই মানানসই হয়। নীচের শ্রেণী হইতে সপ্তম (Class VII) শ্রেণী পর্যন্ত এক বর্ণের হাফ্ প্যাণ্ট ও হাফ্ সার্ট। অষ্টম (Class VIII) শ্রেণী হইতে দশম (Class X) শ্রেণী পর্যন্ত ধুতি ও এক বর্ণের হাফ্ সার্ট। কিন্তু ধুতিটি মালকোচা করিয়া পরিবে—যেমন মেডিকেল স্কুল ও কলেজে ছাত্রেরা পরে। একই স্কুলের একই পোষাকের ছাত্র বলিয়া কৃত কর্মে সহানুভূতি সম্পন্ন করে এবং বাহিরে সম্মান দেয়।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে স্থির করিতে না পারিলে কোনো ফল পাইবার আশা করিতে পারি না। কেবল পুরাতন পদ্ধতির উপর দাগা বুলাইয়া চলিলে—ক্রিয়া কর্মের যুগোপযোগী কর্ম প্রণালী ঠিক করিতে না পারিলে, কোনো ফল পাওয়ার আশা দূরে থাকুক বরং আমরা হাস্যাস্পদ হইব।

আমার বিবেচনায় পূজাপার্বন উপলক্ষে ছাত্রদের একটি সাহিত্য-সভা হইতে পারে। উক্ত সভায় প্রতিযোগী ছাত্রদের পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে—পূজার তহবিল হইতে।

উপহারের পক্ষে বইএর মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর কিছু নাই। বই সবার থেকে খাটি বন্ধু। আজ আছে, এবং চিরকাল থাকিবে। ছাত্রদের যত বই, তত বিত্ত। বইএর মূল্যে তাহারা মূল্যবান।

আমার প্রস্তাবিত সাহিত্য সভার কর্ম প্রণালী এই :—

১। প্রতিযোগিতা :—

(ক) আবৃত্তি—(মহাপুরুষের বাণী)। (১) মহাত্মা গান্ধী—"হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যতার মত আর পাপ নাই" ইত্যাদি। (২) বঙ্কিম—'লাঠি' দেবী চৌধুরাণী হইতে। "সাম্য" বা "লোক সাহিত্য" বা 'কমলাকান্ত' হইতে খানিকটা। (৩) বিবেকানন্দ—'হে ভারত ভুলিও না' ইত্যাদি এবং অন্যান্য। (৪) রবীন্দ্রনাথ—"কর্তারভূত"—' লিপিকা" হইতে। (খ) অভিনয়—"মুকুট" (রবীন্দ্রনাথ) "বিসর্জন" (ঐ) "জন্মদিন"—(খগেন্দ্র মিত্র)" "সহুরে মামা" (সুনির্মল বসু)—"ঝালাপালা" (সুকুমার রায়) যে কোন স্ত্রী চরিত্র বর্জিত নাটক। (গ)

প্রবন্ধ (অন্ততঃ পাঁচটি) (ঘ) নৃত্য। (ঙ) সঙ্গীত—(রবীন্দ্র নাথ, অতুল প্রসাদ, নজরুল্ ইছ্লাম প্রভৃতি। (চ) চিত্র। (ছ) হাতের লেখা। (জ) বাজনা—সেতার, এস্রাজ, তানপূরা, বেহালা, হারমনিয়ম্, বাঁয়া তবলা, বাঁশি ইত্যাদি। (ঝ) বক্তৃতা (পূর্ব নির্দ্দিষ্ট নহে)। (ঞ) হাস্য কৌতুক (রবীন্দ্র নাথ)। (ট) কথোপ-কথন (চলতি ভাষায়)। (ঠ) লাঠি খেলা।

২। পূজার তহবিল হইতে শতকরা বিশ টাকা দিতে হইবে—পুরাতন ছাত্রদের জন্য এক লাইব্রেরীতে—'Old Boys' Corner'—একটি পৃথক আলমারীতে ঐ লাইব্রেরী থাকিবে।

৩। পিতা মাতা পরিবারের ছেলেদের মনোমত বই উপহার দিতে পারেন এবং মাসিক পত্রের গ্রাহক করিয়া দিতে পারেন। ছেলেরাও বন্ধু বান্ধবকে বই উপহার দিতে পারে।

৪। প্রায়ই দেখা যায় দশ কি পনর জন ছাত্র মিলিয়া পৃথক পূজার আয়োজন করে। এই পূজাগুলি বন্ধ করিয়া বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাহাদিগকে আনা দরকার বলিয়া আমি মনে করি।

৫। বিশেষজ্ঞ লোকের দ্বারা 'শিল্প' বিষয়ক বক্তৃতা ব্যবস্থা হইতে পারে। এই সঙ্গে একটি প্রদর্শনী খুলিলে ভাল হয়।

ভদ্রভাবে—ভাল করিয়া জীবন যাপন করিতে হইলে, আর্টের—শিল্পের পূজারী হওয়া প্রয়োজন। শিল্পের সূক্ষ্ম অনুভূতি না থাকিলে জীবন নীচের দিকে নামিয়া মানুষকে ইতর করিয়া ফেলে। কথাবার্তা, চালচলন, আচার ব্যবহার সবই নিম্ন শ্রেণীর হইয়া পড়ে।

